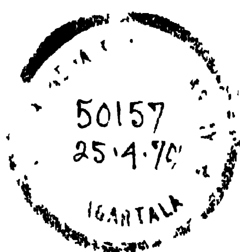
হো চি মিন
ও
ভিয়েতনাম

বরুণ সেন



পরিবেশক

মৌসুমী প্রকাশনী

১৫।২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ
কলিকাতা—৯

মুদ্রক :
শ্রীশরৎচন্দ্র গুঁড়ে
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীপ্রণব শূর

দাম : সাত টাকা

হো চি মিনের মহান স্মৃতির উদ্দেশে…

হো চি মিন ও ভিয়েৎনাম···। নামকরণের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। হো চি মিনের মহান জীবন-কথা লিখতে গিয়ে স্বভাবতই ভিয়েৎনামের কথা চলে আসে। আবার ভিয়েৎনামের প্রসঙ্গ থেকে ফিরে আসতে হয় হো চি মিনের কথায়। অর্থাৎ এক কথায় ভিয়েৎনামের জন্য হো চি মিন; হো চি মিনের জন্য ভিয়েৎনাম। হো চি মিন ও ভিয়েৎনাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু হো চি মিন আজ শুধু ভিয়েৎনামের নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে 'আলোকের দূত'! হো চি মিনকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু তাঁর মহান জীবনাদর্শ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, জীবন যাপনের ইতিহাস আজকের এবং আগামী দিনের দুনিয়ায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে···।

ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তার পরিণতির ও হো চি মিনের কিছু চিত্র এ গ্রন্থে দেওয়া হল···তবে একথা ঠিক, তাঁ. মহান জীবনের বিশাল কর্মধারাকে সীমাবদ্ধ বই-এর পৃষ্ঠায় ধরে রাখা কঠিন।

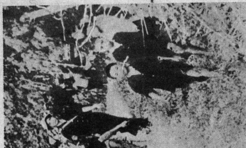
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, এরপর পাঠক-সাধারণের বিচারের রায়ের জন্য প্রতীক্ষায় রইলাম।

কলকাতা —লেখক

হো চি মিন ও ভিয়েতনাম



শিশুদের সঙ্গে চাচা হো এবং আজীবন সংগ্রামী মানুষটির একটি সুকুমার দিক।

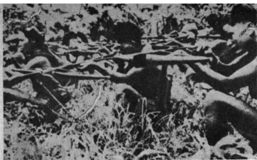


[redacted]



ভিয়েৎকং সৈন্যদের একটি ইউনিট ফ্রন্টে চলেছে।





মার্কিণ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ভিয়েতনামী জনযোদ্ধা।







[redacted]



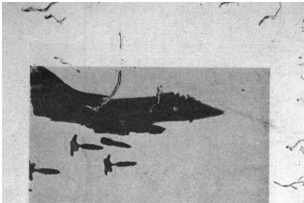
[redacted]বাদী অত্যাচারকে



[redacted]



[redacted]



[redacted]

[redacted]



[redacted]ার প্রশ্ন : অসহায়
[redacted]ই আক্রমণ কেন ?
[redacted] পালন করছি।

[redacted]





[redacted] াংকি বাহিনীর



[redacted]

সাবাশ ভিয়েৎনাম।

ভিয়েৎনাম লাল সেলাম !!

কমরেড হো চি মিন জিন্দাবাদ !!!

বন্ধু, তোমাকে সেলাম্। তুমি দীর্ঘজীবি হও। তোমার মহান আদর্শ, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর প্রতিটি মানুষের অন্তরে প্রজ্বলিত করুক সাম্য মৈত্রী ভাতৃত্বের অনির্ব্বাণ শিখা। তোমার মুক্তির আকাশের উজ্জ্বল আলোয় দীক্ষা নিক নতুন দিন, স্বপ্ন, সম্ভাবনা। মানুষের ধর্ম তো মানবতায়, হিংসা তো পশুত্বের প্রকাশ। মুখ আর মুখোসের অন্তরালে যারা আজ দেশে-দেশে ঘরে-ঘরে কামনা লালসা চরিতার্থের সুযোগ সন্ধানী, তারা তো মানুষ নয়। পশু? না-না তাই বা কেমন করে হয়, পশুরও তো হিংসা প্রকাশের সময় আছে। ক্লান্তি আছে। কিন্তু যারা দিবানিশি অষ্টপ্রহর, দিনের পর দিন, পৃথিবীর দেশে দেশে ঘরে ঘরে মানুষের জীবনে, তাদের স্বপ্ন সাধনার পথে, স্বার্থ আর ব্যাভিচারের আবর্ত সৃষ্টি করছে, ক্ষমতাব দম্ভে উন্মত্ত হ’ বিসর্জন দিচ্ছে মানব ধর্ম, তারা কী মানুষ?

না। তারা মানুষ নয়। মানুষের ধর্ম তো প্রেম ভালবাসা মৈত্রী। মানুষের পরিচয় তো মনুষ্যত্বের প্রকাশে। তারা মানুষ নয়, পশু বললে তাদের ভুল বলা হয়, তারা শয়তান।

ভিয়েৎনাম তুমি মুখোসধারী শয়তানদের মুখোস খুলে দিয়েছো। ভিয়েৎনাম তুমি তোমার শক্ত হাতে ভেঙ্গে দিয়েছো শয়তানীর দম্ভ। দুনিয়ার মানুষ তাই তোমাকে সেলাম জানা’চ্ছে। শত শহীদের রক্তে

রাঙ্গা ভোরের আকাশে তোমার যাত্রা যেন সার্থক হয়। সেই পথ, আলোক সন্ধানী মানুষ তোমার দিকে চেয়ে আছে সশ্রদ্ধ ভালবাসায়, তোমার যাত্রা পথের রক্ত-চন্দনের ফোঁটা নেবে বলে। তুমি যে মানুষের আশা আকাঙ্খা স্বপ্নের একটি নাম।

আর তুমি? যদিও তুমি ভিন্ন নও, তুমি এক এবং অভিন্ন। তবু তোমাকে সেলাম। সেলাম বন্ধু!

সেলাম কমরেড হো চি মিন!

হো চি মিন। আজকের মানুষ, দুনিয়ার মানুষের কাছে এই নামেই তিনি পরিচিত। এ নাম তাঁকে কেউ দেয়নি, নিয়েছেন নিজেই। জীবনের চলার পথে বহুবার বহু নাম তিনি গ্রহণ করেছেন। কখনো দু-এক মাস, কখনো দু-এক বছর নতুন নামে পরিচিত হয়েছেন মানুষের কাছে। পরিবর্তন হয়েছে নামের, পরিবর্তন হয়নি মানুষটির, তাঁর স্বপ্ন-সাধনা সংগ্রামের। মুক্তি চাই, স্বাধীনতা—আমার পিতৃভূমি ভিয়েৎনামীদের আপন অধিকার। ভিয়েৎনামের বন্ধন মুক্তিই আমার একমাত্র সাধনা।

সেই সাধনা তাঁর সফল হয়েছে। সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি। স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে ভিয়েৎনামের আকাশে। কিন্তু এমন স্বাধীনতা তো তিনি চাননি, স্বপ্ন দেখেননি বিভক্ত ভিয়েৎনামের। উত্তর আর দক্ষিণ। শয়তানদের দল কৌশলে অঙ্গচ্ছেদ করেছে দেশের। তিনি যা চাননি নিরুপায় হয়ে তাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বেদনায় হাহাকার করে উঠেছে অন্তর। নীরব অশ্রুতে ভেসে গেছে বুক। রুদ্ধকণ্ঠে বলেছেন, আমি পারলাম না, আমায় তোমরা ক্ষমা কোর!

ক্ষমা! কিসের ক্ষমা? ক্ষমা প্রার্থনা করে অপরাধী। কিন্তু তুমি তো কোন অপরাধ করোনি। তোমাব সাধনা তো সিদ্ধিলাভ করেছে, সফলতা লাভ করেছো তুমি। উত্তর দক্ষিণের ব্যবধান তো তুচ্ছ।

শয়তানের দলের এই শয়তানীটুকু রোধ করার সাধ্য কারো ছিল না। ভিয়েৎনামকে ভাগ করেছে তারা। মেনে নিতে ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়েছি। হয়েছি আলাদা। কিন্তু মনের দুয়ার আমাদের তেমনি মুক্ত। তুমি আছ, আমরা আছি, আছে আমাদের সেই মন। যে হৃদয় তোমাব ছবি এঁকে নিয়েছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। যে প্রাণ তোমার বন্দনা গায়। বিভেদের প্রাচীর, ব্যবধানের দূরত্বটুকু আমরা অতিক্রম করবোই। আমরা এক হয়ে মিলে যাব, মিশে যাব, একজাতি একপ্রাণ হয়ে তোমার প্রজ্ঞার আকাঙ্খাকে সার্থক করে তুলবো। তোমার স্বপ্ন স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলা আমাদেব জীবনের একমাত্র কর্তব্য, সত্য!

হো চি মিন, শয়তানের দল আমাদের আলাদা করেছে কিন্তু আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি আমরা এক এবং অভিন্ন। হো চি মিন তুমি আমাদের স্বপ্নের প্রতীক। আমাদের সাধনার গুরু। জাতির জনক তুমি!

ভিয়েৎনাম! ভিয়েৎনামেব প্রতিটি মানুষ, উত্তর দক্ষিণে কোন ভেদ নেই, প্রতিটি মানুষের রক্তে একটি নামেব গুঞ্জন বুকের গভীরে একটি উজ্জ্বল ছবি, একটি মানুষ, হো চি মিন।

কিন্তু ১৮৯০ সালের ১৯শে মে বর্তমান উত্তব ভিয়েৎনামের সুদূর নৃখেআন্‌ প্রদেশে সামান্য এক চাষীর পর্ণকুঠীবে যে শিশু প্রথম পৃথিবীর আলো দেখল, সে শিশুর নাম নগুযেন থান থাট্। পিতা নগুয়েন মিন হুয়ে।

নগুয়েনের জন্মের কয়েক বছর আগে ১৮৮৩ সালে ইন্দোচীনের টংকিন, আনাম বা আন্নাম আর কোচিন চায়না, যা নিয়ে আজকের উত্তব আর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গঠিত তাব সব টুকুতে ফরাসীরা তাদের জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করেছে। সম্রাট তু ডুকের উয়ের রাজদরবার নিরুপায় হয়ে মেনে নিয়েছে সে শাসন।

অষ্টাদশ শতকেই ভিয়েৎনামে ফরাসীদের আগমন। পরম পিতা যীশুর বাণী প্রচারের উদ্দেশে মিশনারীর দল মুখে হাসি, মনে বিষের ছুরি সানাতে সানাতে এগিয়ে এল ভিয়েৎনামীদের উদ্ধারে। অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় উত্তরণের ব্রতধর্ম প্রচারে ব্রতী হল তারা। বুদ্ধের বাণীকে নস্যাৎ করে খ্রীষ্টের বাণীর কাড়া নাকাড়া বাজাতে সুরু করল তারা। লোভ আর লালসার আগুন জ্বালাতে চাইল মানুষের মনে। সর্ব্বত্যাগী পরম পিতা যীশুর সন্তানেরা অল্প দিনের মধ্যেই হয়ে উঠল প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। মিশন কেন্দ্রগুলি ধর্মপুস্তকের পরিবর্তে ভরে উঠল অস্ত্রসস্ত্রে।

সম্রাট তখন মিং মাং। মিশনারীদের কার্য কলাপে বিচলিত হলেন তিনি। সর্তক হলেন। কঠিন হলেন ধর্মের ভেকধারী পাষণ্ডদের শয়তানীর পরিচয় পেয়ে। কিন্তু মিশনারীদের সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করবেন তাও সহসা স্থির করে উঠতে পারলেন না। তাঁর মন্ত্রীসভাও তাঁকে সিদ্ধান্ত জানাতে অসমর্থ হল।

অবশেষে তিনি আপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওদের ডাকলেন। অনুরোধ জানালেন, ভিয়েৎনামীদের তাঁরা যেন সর্ব্বনাশা পথে টেনে না নাবান। দেশ জাতি ঐতিহ্যের অপমৃত্যু ঘটানো শুধু অন্যায় নয়, মহাপাপ। খৃষ্টের বাণী তো এই পাপের পঙ্কে সুস্থ শান্তিপ্রিয় মানুষকে নামাতে বলেনি। ধর্মের মুখোসের অন্তরালে অধর্মের বীজ বপন তো মনুষ্যত্বের পরিপন্থী।

হাসল ওরা। বলল, মিথ্যা এ অভিযোগ। আমরা সেই পরম পিতা যীশুর মত ও আদর্শ, তাঁর অমৃতময় বাণীই শুধুমাত্র এতদিন প্রচার করেছি। তাঁকে জীবনের সার করে সেবা করেছি মানুষের। ভিয়েৎনামীরা আমাদের ভাই বন্ধু আত্মার আত্মীয়। ভাইয়ের বেদনার অশ্রু, তাদের অন্তরের ব্যথায় ব্যথী হয়েছি আমরা। যীশুর ধর্ম তো সেবায় ত্যাগে মহত্বে, সেই পরম পিতা মঙ্গলময়ের করুণার আশায়

মানবের সেবা ধর্মে আমরা দীক্ষিত। সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত তো আমরা হইনি।

সরল সহজ মিথ্যাটুকু অসঙ্কোচে বলে গেল তারা। এতটুকু দ্বিধা করল না, গলার স্বরটুকু কাঁপল না একবারও। উপরন্তু প্রকারান্তরে সম্রাটকে বলল কেবল মিথ্যাবাদী।

শুনলেন সম্রাট। শয়তানীর শেষ মুখোসটুকু খুলে গেল শেষ বারের মত। কোন চিন্তা নয়, মিথ্যা দ্বিধা ভীরুতার প্রকাশ কঠিন কণ্ঠে আদেশ জানালেন তিনি। ১৮৩৩ সালে সম্রাট হুকুম-নামা জারি করলেন। ফরাসী মিশনারীদের নয়, দেশের মানুষকে সাবধান কবে দিলেন, ভিয়েৎনামীরা যদি তাদের আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মিশানারীদেব প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ক্ষমা তার নেই। তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বললেন, যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আমাদের দেশে এসেছিলেন তাঁদের আমরা সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম একদিন। কারণ আমরা জানি ,বিশ্বাস করি ধর্ম মানুষের প্রাণের সম্পদ। আমাদের ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ না হতে। বুদ্ধত্বের মহিমা আমাদের আশ্রিতকে রক্ষা, ক্ষুধার্তকে অন্ন, মুমূর্ষুকে সেবা করতে শিক্ষা দিয়েছে। তাই আমবা ধর্মের মুখোসধারী ফরাসী মিশনারীদের আগমনে বাধা দিইনি, দিয়েছি আতিথ্য। কিন্তু সেই আতিথ্যের ফল যে এমন বিষময় হবে, আমাদের সমাজজীবন ধর্ম যে ওঁরা এমনভাবে কলুষিত করবেন এ আমাদের চিন্তার অতীত ছিল। ধর্মের মুখোস এঁটে যাঁবা আমাদের বন্ধু পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা মানুষ নন—শয়তান। ধর্ম ওদের ভেক।

খ্রীষ্টের ধর্ম নিয়ে যাঁরা আমাদের দেশের বুকে অধর্মের বেসাতী করছেন তাদের আমরা ঘৃণা করি। ধর্মের উপাসনা-গৃহ

নয়, অধর্মের আখড়াগুলি আর যাজকদের বাড়ীগুলি ভেঙে চুরমার করে দাও। ভিয়েৎনামের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন কর বিদেশী মিশনারীদের।

সম্রাট মিন মাংয়ের হুকুমনামা নয়, তিনি ডাক দিলেন মানুষকে। মিশনারীদেব বিরুদ্ধে সুরু হল অভিযান। বাধা যে এল না তা নয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সুরু হল বিবাদ। বিদেশী মিশনারীদের রক্ষা করতে ভিয়েৎনামী খ্রীষ্টানরা বাধা সৃষ্টি করল। স্তিমিত হল বিধর্মীদের প্রতি অভিযান। ভাইকে আঘাত হানতে পারল না ভাই। কারণ শবীবে যে তাদের একই রক্তধাবা প্রবাহিত হচ্ছে।

কিন্তু বিদেশী মিশনাবীদেব বিরুদ্ধে আন্দোলন থামল না। প্রবল আকাব ধারণ কবলো পববর্তী সম্রাট থিউ ত্রিব সময়। সম্রাট তু দুক সব কিছু বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা কবে সাধাবণ মানুষের সঙ্গে রাজশক্তি নিয়োজিত কবলেন ভিয়েৎনামেব মাটি থেকে সমস্ত বিদেশী মিশনারীদেব নিশ্চিহ্ন করতে। উন্মত্ত আক্রোশে ফেটে পড়ল মানুষ। সর্ব্বনাশকারী শয়তানের দলের টুঁটি চেপে ধবলো তাবা। নিহত হল অসংখ্য স্পেনীয় আর ফরাসী মিশনারী। ধর্মপ্রচার কিংবা মানুষের সেবাব্রত নিয়ে নয়, ভিয়েৎনামেব মাটিতে পা রেখেছিল গোপনে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের বনিয়াদ দৃঢ় করতে।

তাদের সে চেষ্টা সফল হয়েছিল। স্পেন আর ফরাসীবা নিরীহ ধর্মযাজকদেব হত্যার বেদনা সহ্য করতে পারল না। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগটুকু হেলায় হাবাল না তাবা। এ তাদের বহুদিনের প্রতীক্ষা। সুযোগ এসেছে। সে সুযোগটুকু পুবোমাত্রায় কাজে লাগাল। পৃথিবী জানল অন্যায় হত্যাব প্রতিশোধ নিচ্ছে স্পেন আব ফ্রান্স। ১৮৫৮-৫৯ সালে ফরাসী আর স্পেনীয়বাহিনী দা নাং আক্রমণ কবলো, অধিকার কবল সায়গন। ভিয়েৎনামে সুরু হল ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠাব সূত্রপাত। তারপর ১৮৮৩ সালে হ্যানয়

আর হাইফং ফরাসীদের হাতে যাবার পরই ভিয়েৎনামে সুরু হল বিদেশী শাসন।

কিন্তু হত্যার প্রতিশোধ! অসংখ্য ধর্মযাজকদের যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে বৈকি। প্রতিশোধ যদি না নেওয়া হয় তাহলে সেই পরম পিতা যীশুর আত্মা, বিধর্মীদের হাতে তাঁর সন্তানদের নিষ্ঠুর হত্যায় শান্তি পাবে না।

সুরু হল অত্যাচার। অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হল নিরীহ মানুষগুলো দোষী নির্দোষীর বিচার নেই। তোমরা ভিয়েৎনামী। তোমরা অপরাধী। আমরা তোমাদের প্রভু বিচারক। আমরা বিচার করবো, তোমাদের শাস্তি দেব। আমাদের শাস্তি তোমরা মাথা পেতে গ্রহণ করবে · যে কোন শাস্তি। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে না। তোমরা ক্রীতদাস, আমাদেব আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। আমাদের যে কোন আদেশ, ন্যায় হোক অন্যায় হোক, ন্যায় অন্যায়ের বিচারক তোমরা নও—আমরা, ন্যায় অন্যায় বিচার বুদ্ধি বিবেক সব আমাদের অধিকারে। আমরা তোমাদের প্রভু। ভিয়েৎনামেব প্রভু আমরা।

তোমাদের ক্ষেতের ফসল আমাদের। তোমাদের পরিশ্রমের ফসল দিয়ে আমাদের সুখের প্রাসাদ তুলেছি রিভিয়েরায়। তোমরা যারা প্রতিবাদ করেছো তারা মরেছো। কারণ কোন প্রতিবাদের অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা আমাদেব কাছে মানুষ নও, পশু। তোমাদের শুকমাত্র অধিকার ভারবহনের। তোমাদের একমাত্র পরিচয় ভিয়েৎনামী।

হয়তো ভাবছ ভারবহন ছাড়াও তো আরো কিছু কর তোমরা। কাজ কর। হ্যাঁ কাজ কর সত্য। কিন্তু সে কাজ তোমাদের দেশের মুষ্টিমেয় ক্যাথলিকদের জন্যে। ভিয়েৎনামীহলেও তারা আমাদের ধর্মকে ভালবেসেছে, গ্রহণ করেছে। তাদের আমরা আমাদেরই আপনজন বলে মনে করি। কারণ আমাদের ধর্ম এই শিক্ষাই দিয়েছে আমাদের।

যীশুর সন্তানেরা কালো সাদা সমান। ভিয়েৎনামী হলেও তারা খ্রীষ্টান। তারা সবাই পরম পিতার সন্তান।

আর শোন। আরো একটা কথা তোমাদের বলা হয়নি। তা তোমাদের নারীদের কথা। তোমাদের মা বোন স্ত্রী কন্যার কথা। তোমাদের যারা মা বোন স্ত্রী কন্যা, আমাদের কাছে তারা ভোগের সামগ্রী। তোমাদের নারীদের ইজ্জতের মূল্য আমাদের কাছে কানা-কড়িও নয়। একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে তোমাদের নারীদের যদি তুলনা করতে যাও তাহলে কিন্তু ভুল করবে। ফ্রান্সের পথের একটা কুক্কুরীর সঙ্গে তোমাদের নারীর তুলনা করতে আমরা লজ্জাবোধ করি।

তোমাদের মা ভগ্নী স্ত্রী কিংবা কন্যাকে যদি কোন ফরাসী তার দৈহিক ক্ষুধা চরিতার্থের জন্যে আহ্বান জানায় তোমরা নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে কোর। যদি সেই ফরাসী দয়াপরবশ হয়ে তোমাকে তোমার কন্যার দেহ থেকে 'আওদাই'টি খুলে নিতে বলেন তুমি কৃতার্থ হয়ে যেও।

ঠিক এমনি দিনে। পাশ্চাত্যের এক সুসভ্য জাতি, শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে গুণে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার, ভিয়েৎনামের মাটিতে তাদের বর্বরতার চরম প্রকাশ। তাদের সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ভিয়েৎনাম শুধুমাত্র শোষিত কিংবা শাসিত হলনা, সভ্যতার প্রকাশ ঘটাতে লাগল নিত্য নতুন অত্যাচারে, সাধারণ মানুষের জীবনকে পশুর স্তরে নামিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচারী ঔপনিবেশিক লুঠেরার দল তাদের পৈশাচিক শাসন আর হিংস্র থাবায় মানুষকে করতে লাগল দলিত পিষ্ঠ।

ঠিক এমনি দিনে। ১৮৯০ সালের ১৯শে মে জন্ম নিল একটি জীবন। একটি ক্ষীণ দুর্বল শিশু। প্রথম আলোর স্পর্শে চিৎকার করে কেঁদে ওঠেনি সে। চোখ মেলেছিল, তার শান্ত দু' চোখের

তারায় বুঝি জ্বলে উঠেছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ? দেখেনি কেউ, দেখলেও পড়তে পারেনি সে চোখের ভাষা।

ক্ষীণ দুর্বল শিশুটিকে দেখে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। কেউ হয়তো অসতর্কভাবে বলেও ফেলেছিল সে কথা। বাঁচবে না, বাঁচবে না। শিশুর প্রাণশক্তি বড় দুর্বল, নিঃশ্বাসের গতি ক্ষীণ।

কষ্ট হচ্ছে শিশুর। ফুসফুস তার বাতাস গ্রহণ করতে পারছে না সহজ স্বাভাবিকভাবে। অসহ্য কষ্টে যন্ত্রণায় বারবার মুষ্টিবদ্ধ করছে দুই হাত। কাঁদছে না। কণ্ঠ নীরব।

কিন্তু সকলের আশঙ্কাকে ব্যর্থ করে দিয়ে শিশু বাঁচলো, বড় হল। সদা ভয়ে শঙ্কিতা জননীকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভয় কী মা আমি তো রয়েছি।

তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। ভিয়েৎনামের মুক্তির আকাশে তিনি উজ্জ্বল শুকতারা। তাঁর সঙ্কল্প সাধনা আত্মত্যাগ ভিয়েৎনামকে করেছে স্বাধীন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু সে সাধনার শেষ হয়নি। আজীবনের ব্রতভঙ্গের কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করেনি। বন্ধুর ছদ্মবেশে শত্রু এসে হাত ধরেছিল। বিশ্বাস করেছিলেন তিনি। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তিনি শক্ত হাতেই দিয়েছেন। ফরাসীরা তাদের উদ্ধত মস্তক নত করে পালিয়ে বেঁচেছে। ফ্রান্সকে সাহায্যের আছিলায় এসেছে আমেরিকা: তার একমাত্র বুলি এশিয়ায় কম্যুনিজম রোধ করতে হবে। সেই থেকে সে ভিয়েৎনামে আছে। আছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। মার খাচ্ছে। শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে তার। কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে সে, কিন্তু চলার শক্তি নেই। সাধ্য কী তার প্রাণের আগুন নেভায় ?

তবু যাচ্ছে না। যেতে পারছে না। সম্মান প্রতিপত্তি। সম্মান তার ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে তবু তার হুঁশ নেই। তার আশা, সে

প্রতীজ্ঞা করেছে ভিয়েৎনামকে সে তার পায়ের তলায় মাথা নত করাবেই।

কিন্তু তাকি হয়? হয়না। সাধ্য কী আমেরিকার। কাদের সে তার পায়ের তলায় মাথা নত করাবে, ভিয়েৎনামীদের? কিন্তু ওরা তো শুধুমাত্র ভিয়েৎনামী নয়, আগুন। যে আগুনে ফরাসীরা পুড়েছে, পুড়তে পুড়তে বুদ্ধিমানের মত বোকা আমেরিকাকে কাক-তাড়ুয়া সাজিয়ে রেখে পালিয়ে বেঁচেছে। পুড়ছে আমেরিকা। বুঝতে পারছে সে। হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় তার অসহ্য দাহ যন্ত্রণা। পালাতে পারছে না। 'প্রেষ্টিজ'—তাদের বিশ্বব্যাপী সম্মান ধূলিস্মাৎ হবে।

কিন্তু সম্মান কী তাদের আছে? মানুষ কী তাদের বর্বরতাকে ক্ষমা করেছে, মানুষের শ্রদ্ধা কী পায় তারা?

পায়না। পেতে পারে না। পারে না ভুল স্বীকার করে অপরাধীর কাঠ গোড়ায় বিচারের জন্যে দাঁড়াতে। পৃথিবীর দেশে দেশে নয়া সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদ যারা পাততে চায় তাদের মৃত্যু ভিয়েৎনামের আগুনে।

সে অগ্নিহোত্রীর নাম হো চি মিন।

১৯০১ সাল।

নগুয়েন মিন হুয়ের সংসারে নেমে এল বিপর্যয়ের কালো মেঘ। দশ বছরের একটা ছেলেকে একলা রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল তার অতি আপনার জন। মাতৃহারা হল তিনটি ছেলে মেয়ে। কিন্তু চোখের জলে সব সময় বুক ভাসাতে লাগল নগুয়েন থান থাটের। মায়ের হাতের চুড়ো করে বাঁধা রুক্ষচুলের শেষ বিনুনী। কটা দিন খেল না, ঘুমাল না, দিন রাত্রি কান্না আর কান্না। হেলায় পড়ে রইলো অতি সাধের ছিপগুলি।

দিন রাত্রি ম্লান-মুখ বিষন্ন একটি বালক কিন্ লিয়েন গ্রামের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় একা একা। কী এক চিন্তা বেদনা ঘিরে রাখে তাকে। মুক্তি নেই। নেই আলো। সর্বহারা বালক বুঝি পথ খোঁজে।

ঠিক এমনি সময় নগুয়েন মিন হুয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন হুয়েতে। পাঠশালার পাঠ শেষ হয়েছিল, হুয়েতে এসে ভর্তি হল বড় স্কুলে। সেখান থেকে ফান্ থিয়েটে। আর এখানেই ১৯১১ সালে একদিন লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে চলে গেল সায়গনে। নতুন জীবনের সন্ধানে।

১৯০১ থেকে ১৯১১ দশটা বছর সহজ ভাবে কাটেনি থান থাটের। হুয়েব স্কুলের হেডমাষ্টাব ছিলেন ফরাসীদের বংশবদ। কুয়োক হোক মাধ্যমিক বিত্থালয়ে ভিয়েৎনামী ছেলেদের সহপাঠী ফরাসী ছেলেরাও। কিন্তু হেড মাষ্টারের ব্যবহার ছিল একতরফা। ফরাসী ছেলেরা শত অপরাধেব শাস্তি পায়না, ভিয়েৎনামী ছেলেবা অজান্তে সামান্য অপরাধ কবে দোষ স্বীকাব কবলেও শাস্তিব হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই তাদের। অপরাধ না করেও শুধুমাত্র ফরাসী ছেলেদেব অভিযোগে নির্বিচাবে ভিয়েৎনামী ছেলেদেব কঠিন শাস্তি দেন হেডমাষ্টার।

অন্য মাষ্টাব মশাইরাও নীবব থাকেন। নীবব থাকতে বাধ্য হন তাঁরা। কারণ হেডমাষ্টাবের বিরুদ্ধাচারণ করছেন এই অভিযোগ যদি কর্তৃপক্ষের কানে নিয়ে পৌছায় তাহলে নিষ্কৃতি তারাও পাবেন না। শাসক শ্রেণী ছলে বলে কৌশলে তাঁদেরও শাস্তি নিতে বাধ্য করাবেন।

অন্যান্য মাষ্টাব মশাইবা কর্তৃপক্ষেব ভয়ে অসহায়। নিরপরাধী ছেলেগুলি তাঁদের চোখেব সামনে দিনেব পর দিন কঠিন শাস্তি ভোগ কবতে লাগল। দেখেও মুখ ঘুবিয়ে থাকতে বাধ্য হলেন তাঁরা। হেডমাষ্টাবেব অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন না।

প্রতিবাদ জানাল ছেলেরাই। হেডমাষ্টারের অন্যায়ের প্রতিকার করতে সঙ্ঘবদ্ধ হল।

ক্লাশ রুমে মাষ্টার মশাইদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা উঠে দাঁড়ায়। তাঁর আগমনকে অভ্যর্থনা জানায়। এই রীতি। কিন্তু সে রীতি লঙ্ঘিত হয়। লঙ্ঘন করে ফরাসী ছেলেরা। তারা নীরবে বসে থাকে যে যার নিজের আসনে। ভিয়েৎনামী মাষ্টার মশাইদের আগমনকে উপেক্ষা করে তারা। কারণ তারা জানে, তাদের সুকুমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, তারা ভিয়েৎনামের প্রভু। কোন ভিয়েৎনামী মাষ্টার মশাইকে সম্মান জানানো উচিৎ নয়। হেডমাষ্টারও সমর্থন জানিয়েছেন তাদের ঔদ্ধত্যকে।

একদিন হেডমাষ্টার ক্লাসে প্রবেশের পর ফরাসী ছেলেদের সঙ্গে ভিয়েৎনামী ছেলেরাও তাদের আসনে চুপচাপ বসে রইলো। মুখ ঘুরিয়ে রইলো অন্যদিকে। রাগে দুঃখে অপমানে চিৎকার করে উঠলেন ফরাসীদের বংশবদ হেডমাষ্টার। জবাবদিহি করতে বললেন। কিন্তু কে জবাবদিহি করবে? কিসের জবাবদিহি? সকলেই নীরবে বসে রইলো যে যার আসনে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন হেডমাষ্টার। তার খানিক পরে একে একে অফিস ঘরে ডাক পড়লো ভিয়েৎনামী ছেলেদের। ডাক এল নগুয়েন থান থাটের। স্কুলের সবচেয়ে নিরীহ গো বেচারা ছেলেটার।

অফিস ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হেডমাষ্টার তার দিকে চাইলেন। হাসলেন। শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে আহ্বান জানালেন, এসো নগুয়েন! ছেলেটা হেডমাষ্টারের সামনে নীরবে গিয়ে দাঁড়াল।

হেডমাষ্টার তাকে কয়েক মুহূর্ত্ত দেখলেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমাকে কেন ডেকেছি বলতো?

ছেলেটা নীরব। সে কিছু জানেনা। হেডমাষ্টার কেন ডেকেছেন সেটুকু বোঝবার মত শক্তি তার নেই।



হেডমাষ্টার এবার বললেন, তুমি কী ওদের দলে ?

তবু সে চুপ করে রইলো। দল যে কী তাও বুঝি সে জানেনা।

আমাকে যে তোমরা অসম্মান জানালে একি ওরা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল ? তুমি নিশ্চই আমাকে অসম্মান জানাতে চাওনি ?

এবারেও সে নীরব।

তোমাকে কে বসে থাকতে বলেছিল ? ওদের দলে কে-কে আছে ?

আমরা সবাই।

তোমরা সবাই ? বিস্ময়েব যেন শেষ ছিলনা হেডমাষ্টারেব।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিনীত উত্তর দিয়েছিল ছেলেটা।

না-না ! যেন বিশ্বাস করত্তে পাবেননি হেডমাষ্টার। আপন মনেই মাথা নেড়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। নিশ্চয়ই তুমি সত্য কথা বলছ না। কারণ আমি যে তোমাকে চিনি। নিশ্চই ওরা তোমাকে বলেছিল বলেই তুমি···

আজ্ঞে না।

না ! গর্জে উঠেছিলেন হেডমাষ্টার।

আমরা যা কবেছি সকলে মিলেই করেছি।

অন্যায় করেছো তোমরা।

আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ জামিয়েছি।

আমার অন্যায় ?

নিশ্চই ! শান্ত শীর্ণ ছেলেটার কণ্ঠ গর্জে উঠেছিল যেন। বলেছিল, আপনি শিক্ষক, আমরা ছাত্র, ছাত্র ফরাসী ছেলেরাও। শিক্ষকদের সম্মান দেওয়া ছাত্রদেব অবশ্য কর্তব্য। সেখানে দেশ জাতি উচ্চ নীচের কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু আপনি···

আর কিছু বলতে হয়নি ছেলেট ক। হেডমাষ্টারের চিৎকারে

কণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল তাঁর। তার শিশুকণ্ঠের প্রতিবাদ সেদিন বাধা পেয়েছিল, কিন্তু অন্যায়কে মেনে নেয়নি। গ্রহণ করেছিল শাস্তি।

কিন্তু একদিনের সেই বালকের কণ্ঠ যে সত্যই স্তব্ধ হয়ে যায়নি তার প্রমাণ বহুভাবে পেয়েছে মানুষ। পৃথিবীর মানুষ শুনেছে তাঁর অন্যায়ের আর অসত্যের বিরুদ্ধে বজ্র নির্ঘোষ। হো চি মিন-এর কণ্ঠস্বরে জেগেছে মানুষ, একটা সমগ্রজাতি, ভিয়েৎনাম।

তাঁর সাবধান বাণী শোনেনি ফ্রান্স, আমেরিকা। ফ্রান্স তার মূল্য দিয়েছে। শেষ হয়েছে তাব ঔদ্ধত্য। মিটেছে তার সাম্রাজ্য-বাদের নির্লজ্জ ক্ষুধা। আজ সে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরের ক্ষতের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। আমেরিকার আরম্ভ হয়েছে রক্ত শোষণ। বেহুঁশ মাতাল একটা জাতি, জঘন্য মনোবৃত্তি যার জীবনের একমাত্র সম্বল, ছোট্ট ভিয়েৎনামের হাতে মার খাচ্ছে, প্রায়শ্চিত্ত করছে, তার অন্যায়েব-পাপের। ভিয়েৎনাম তার রক্ততৃষ্ণা চিরদিনেব মত শেষ করে দেবে। সেদিনের আর বাকি নেই। আসছে, সেদিন আসবেই। যেদিন আমেরিকার শেষ কবর খোঁড়া হবে ভিয়েৎনামের মাটিতে। দেশভক্ত ভিয়েৎনামীদের পায়েব তলায়।

সেই মৃত্যু যজ্ঞেব ঋষির নাম হো চি মিন। একটা জাতির বলিষ্ঠ কণ্ঠ, শক্ত হাত। পথ নির্দেশ কবেছেন তিনি, চালিত করেছেন সঠিক পথে। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র সহরে, নগরে, বন্দরে, গ্রামে গ্রামে, মানুষের আচ্ছন্ন চেতনাকে জাগরিত করেছেন, যারা ঘুমিয়েছিল তাদের হাত ধরে তুলেছেন, মদ আর আফিংয়ের নেশাগ্রস্ত চোখে দেখিয়েছেন পরাধীনতা দাসত্ব আর অপমানের জ্বালা। বুকের জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপে হাত সেঁকে নিয়ে শীতের কুয়াশা ঝরা রাতে ভিয়েৎনামী তরুণ-তরুণী কিশোর বালক দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে রাইফেল। অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়েছে শত্রুর বুক লক্ষ্য কবে। কঠিন প্রতীজ্ঞা

তাদের, ভিয়েৎনামের মাটি থেকে বিদেশী হানাদারদের নিশ্চিহ্ন তারা করবেই।

কখনো বা শত্রুর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে বুক। ভেঙ্গে গেছে হাত। তবু তারা ভগ্ন হাতে শরীরের শেষ শক্তিটুকু নিয়োজিত করে ট্রিগারে রেখেছে আঙুল শেষ বারের মত, মৃত্যু ধূসর চোখে শত্রুর মাথায় লক্ষ্য করেছে, স্থির শেষ বুলেটের ঘায়ে জীবনের শেষ শত্রু মেরে গেছে। মনে মনে বলেছে, আমার মৃত্যুতে দুঃখ নেই, এ আমার আনন্দের মৃত্যু, গর্বের মৃত্যু, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমি এই বিশ্বাস টুকু নিয়ে যাচ্ছি, আমার দেশ ভিয়েৎনাম একদিন শত্রু মুক্ত হবেই। আমার ভাইয়েরা ওদেব ক্ষমা করবে না।

ক্ষমা করেনি ভিয়েৎনাম। মেনে নেয়নি পরাধীনতার গ্লানি। তাই সে সংগ্রাম কবছে, তার লড়াই একদিন জয়যুক্ত হবেই। পৃথিবীর মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা সমগ্র জাতি বলবে, আমবা যুদ্ধ করেছি, মরেছি, তবু অন্যায় আর অসত্যকে মেনে নিইনি। আমাদের এ স্বাধীনতা বুকের রক্ত দিয়ে কেড়ে নিয়েছি। পশু শক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি আমাদেব আপন অধিকার। আমরা আজ সম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণের সাধনাই আজ উত্তরে দক্ষিণে। যুদ্ধবাজদের যুদ্ধের ক্ষুধা মেটাচ্ছে ভিয়েৎনাম। ছোট্ট দেশটা। প্রাণ শক্তিতে পূর্ণ উজ্জ্বল। উত্তরে হো চি মিন দক্ষিণে সম্রাট বাও দাই। কিন্তু ভিয়েৎনামীরা বলেন নেতা আমাদের হো চি মিন। তিনি আমাদের প্রাণ পুরুষ। তিনি আমাদের স্বপ্ন সত্য, আমাদের জাতির মুক্তি দাতা। তাঁর আদেশ নির্দেশই আমাদের জীবনের পথ পরিক্রমার মূল মন্ত্র।

এই পথ পরিক্রমার সুরু ১৯১৮ সালে। আঠারো বছবের এক তরুণ। নাম নগুয়েন থান থাট। স্থান হুয়ে। সব কিছু ভুলে এক প্রাথমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ফলে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে যেদিন নির্যাতনের মাত্রা

চরমে উঠল, সহ্যের অতীত হয়ে উঠল ছুয়েতে বাস করা সেদিন নিরুপায় বাধ্য হয়ে ছুয়ের বাস তুলে দিয়ে যাত্রা করেছিলেন ফান থিয়েট। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন বাসকরা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। বিদেশী শাসকদের অন্যায় জুলুমে সর্ব্ব শরীর জ্বলে ওঠে। প্রতিকারের পথ খোঁজেন কিন্তু কোথায় পথ। নেই-নেই এতটুকু আলো। অন্ধকার নিরেট নিশ্ছিদ্র।

অত্যাচার আব অত্যাচার। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই অত্যাচাবের দৃশ্য। বিদেশী শাসকেব দল যেন ভিয়েৎনামীদের শাসন না কবে থাকতে পাবে না। এক সঙ্গে পথ চলা দায়। প্রভুর দল ক্রীতদাসদের সঙ্গে পথ হাঁটে না। ওদের চলার পথে কোন ভিয়েৎনামীর সামনে পড়া অপরাধ। একমাত্র অপবাধ ভিয়েৎনামীরা ক্রীতদাস-পরাধীন।

ক্রীতদাসের জীবন দেখেছেন তিনি। অনেক দিন আগে, সেই শৈশবে। নৃখে আনের রাস্তা তৈরীব কাজে রত মজুরের দল ক্ষুধায় অন্ন পায়নি, পায়নি তৃষ্ণার জল। দারুণ গ্রীষ্মে সূর্য কিরণে ঝলসে যাচ্ছে দেহ, আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুক—সামনে নদী, কলকল ছল-ছল করে বহে যাচ্ছে মিষ্টি জলেব ঝর্ণা ধারা, কিন্তু খেতে যে যাবে তার হুকুম নেই। কাজের সময়, সময় নষ্ট কবা চলবে না। মজুরী দিচ্ছ? কেন মজুরী কিসেব? কিসের জন্য মজুবী চাও? আমাদের হুকুম পালনে বাধ্য তোমরা, তোমরা ভিয়েৎনামী, তোমাদের মজুরী দেব কেন? দেবনা-দেবনা। ক্ষুধায় অন্ন দেব না, তৃষ্ণার জল দেব না, তোমাদের যা ইচ্ছা তোমবা করতে পার। আমাদের কাজ চাই। তোমাদের শরীরের পবিশ্রম তোমাদের দেহেব শেষ রক্ত বিন্দুটুকু পর্যন্ত।

পালিয়ে এসেছে কোন মজুর। বিদেশী জহ্লাদদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শুধু সন্ধ্যার অপেক্ষায় আশ্রয় চেয়েছে কোন গৃহস্থের ঘরে। অন্ধকার ঘনালে পালিয়ে যাবে সে বনে-জঙ্গলে।

সে আশ্রয় কী নিরাপদ ? না নিরাপদ নয়। সেখানে প্রতিপদে মৃত্যুর বিভীশিখা। তবু সেখানেই পালিয়ে গেছে তারা। মৃত্যুকে বরণ করতে ছুটে গেছে। সহ্য কবতে পারেনি অত্যাচার।

সকলকে লুকিয়ে পলাতক মজুবকে আশ্রয় দিয়েছে বালক। দিনের সূর্য না ডোবা পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছে তাকে। রাতের অন্ধকারে কখন যে দিনের আগন্তুক চলে গেছে জনাতে পারেনি সে। পরদিন এসে দেখেছে কেউ নেই।

শুনেছে মজুরদের বিদ্রোহের কথা। সেদিন বোঝেনি বিদ্রোহ শব্দের অর্থ। চাপা কণ্ঠের আলোচনায় শুধু এইটুকু জানতে পেরেছে, অভুক্ত মজুরের দল কাজ করতে অস্বীকাব করায় ফরাসীরা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে ক'জনকে। তাদের দেহগুলো এখনো পড়ে আছে পথের ধূলায়। আবার কাজ করছে তারা।

শেষ হয়েছে তাদেব বিদ্রোহ !

না, শান্ত হয়নি ভীয়েৎনামীরা। শেষ হয়নি তাদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহ করেছে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মুক্তির সংগ্রামে ভিয়েৎনামীরা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন অত্যাচার অবিচার কোনদিনই তারা মুখ বুজে সহ্য করেনি। নির্বিচারে মেনে নেয়নি অন্যায় আদেশ।

ভিয়েৎনামীরা যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ করছে তারা বংশপরম্পরায়। দিনের পর দিন। হাজার বছর তাদের যুদ্ধের ইতিহাস। সে ইতিহাস রক্তে রাঙা। শত শহীদের বুকের রক্তে বার বার সিক্ত হয়েছে ভিয়েৎনামের মাটি।

ছোট্ট একটা দেশ। নদী পর্বত আর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সমাকীর্ণ একটা দেশ। ছোট ছোট গ্রাম, ধূলি ধূসরিত প্রান্তর। উঁচু ঘাসের জঙ্গল, বাঁশের বন, নারকেলের সবুজ পাতায় ঝিরঝিরিয়ে ওঠে বসন্তের বাতাস। ক্ষণিক বসন্ত। প্রবীণ ঋতু বর্ষার পরে আসে শীত। শীতের শেষের কটাদিন ঘটে বসন্তের আগমন, কিন্তু মানুষগুলির মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় রূপে-রসে--বর্ণে-গন্ধে। বসন্তেব হালকা ছোঁয়ায় মানুষগুলির মন শান্তির বন্দনা গায়। ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বুকের গভীরে, ধর্ম তাদের প্রাণের সম্পদ, হিংসাকে ঘৃণা করে তারা। পৃথিবীর এই একটিই বুঝি দেশ যেখানে বিভিন্ন ধর্ম মতবাদ এক হয়েছে, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কোন অভিযোগ নেই, নেই অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব। এখানে মানুষের একমাত্র ধর্ম—তার পরিচয় মানবতায়। পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে। জীবনের লক্ষ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ, স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসায়।

ছোট্ট একটা জাতি। বর্তমানে জনসংখ্যা তিন কোটি কয়েক লক্ষ। একদিন হয়তো আরো কম ছিল। হাজার বছর আগে। যেদিন প্রথম প্রতিবেশী চীন ইন্দোচীনকে গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে এলো, সেদিন ইন্দোচীনের মানুষ নির্বিবাদে মেনে নেয়নি সে পরাজয়। রাজশক্তির সঙ্গে তারাও এগিয়ে এসেছিল প্রতিবেশী শত্রুর মাটির ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে। পরাজয় অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে, কিন্তু প্রাণ দিয়েছিল হাসতে হাসতে। শক্তি আমাদের সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমরা ভীরু দুর্বল কাপুরুষ নই। জীবনের থেকে দেশের স্বাধীনতা আমাদের কাছে অনেক, অনেক বেশি মূল্যবান।

তার প্রমাণ তারা দিয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে দুর্বার চেষ্টা চলেছে দিনের পর দিন। সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর যুদ্ধের পর এসেছে সফলতা। এসেছিল মুক্তি-লগ্ন। স্বাধীন হয়েছে ইন্দোচীন। সফল হয়েছিল তার স্বপ্ন।

কিন্তু সে স্বপ্ন সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পারেনি সহজ সবল গতিতে। মাটির ক্ষুধা আর সম্পদের লোভে বার বার ছুটে এসেছে হানাদারের দল। লুঠতে চেয়েছে তার শস্যসম্ভার। কারণ অতীতের ইন্দোচীনে বর্তমান ভিয়েৎনামের বুকভরা সম্পদের ছড়াছড়ি। ক্ষুধার অন্নেব এমম অফুরন্ত ভাণ্ডার যে পৃথিবীতে বিরল।

শুধু ইন্দোচীন নয়, উনিশ শতকে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই দেশে দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লুঠপাট আর ভাগ বাঁটোয়ারার এক পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুব আর মালয় গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে। ইন্দোনেশিয়াকে দখল করেছিল ওলন্দাজবা, ফিলিপাইনকে দখল করল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। চীনও বাদ পড়ল না পশ্চিমের কৃপা দৃষ্টি থেকে।

অন্য সব দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বীকার করে নিলেও স্বীকার

করল না ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামের *বুদ্ধিজীবি সমাজ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিদ্রোহ করলেন। নেতা ফান্ দিন ফুং। সঙ্গীরা ছিলেন সকলেই এক-একজন নাম করা পণ্ডিত। সে বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ভিয়েৎনামের ঐতিহ্য রক্ষা। ভিয়েৎনামের সাংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে। তাঁরা বলেছিলেন, দেশটা তোমরা অধিকার করেছো, লুঠছো সম্পদ কিন্তু হাত দিচ্ছ কেন শিল্প সাংস্কৃতিতে? জাতি যদি তার শিক্ষা সাংস্কৃতি হারিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তাহলে কী রইল তাব? পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ কী? এমন অন্যায় তোমরা কোর না। এমন অন্যায় করতে আমরা তোমাদের দেব না।

নিরক্ষরতা ভিয়েৎনামীদের জীবনে ছিল মহাপাপ। সুদূর অতীত থেকে ভিয়েৎনামের মানুষ জীবনকে গড়ে তুলেছে জ্ঞানের আলোয়। সেই আলো থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চেয়েছিল ফরাসীরা। মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে পশুর জীবনযাপনে বাধ্য করাচ্ছিল। মেনে নেননি ভিয়েৎনামের বুদ্ধিজীবি মহল। বার বার প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন তাঁরা। শেযে সঙ্গীদেব নিয়ে ফান দিন ফুং বিদ্রোহ করলেন।

বিদ্রোহ করেছে পণ্ডিতের দল। বিদেশী বর্বরের দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। কলম দিয়ে বিদ্রোহ হয় না। কলম ধরা হাতে অস্ত্র ধরলে সে অস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

হলও তাই। ব্যর্থ হলেন. ফান দিন ফুং। মুষ্টিমেয় মানুষের সাধ্য কী রক্তপিপাসু জানোয়ারদের শায়েস্তা করা। ওরা হিংস্র উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন। বুটের তলায় ধূলিস্যাৎ করেছিল সেদিনের জাতীয় অভ্যুত্থান।

কিন্তু আজ ?

আজ দিন বদলের পালা। আজ শুধুমাত্র পণ্ডিতরা নন, কৃষক শ্রমিক ছাত্র, ভিয়েৎনামের প্রতিটি মানুষ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মরণ পণ যুদ্ধ করে চলেছে। তাদের বুকের আগুন বুলেটের উত্তরে ধ্বংস করছে বিদেশী শয়তানদের।

তাঁর ডাক, ভিয়েৎনামের মুক্তি যজ্ঞে এগিয়ে না এসে কেউ পারেনি। বার বার তিনি মানুষকে ডাক দিয়েছেন। শুধুমাত্র শ্রমিক কৃষককে নয়, তিনি ডাক দিয়েছেন ভিয়েৎনামের শক্তিকে। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন ভিয়েৎনামের প্রাণশক্তিকে।

বলেছেন, ধনী, সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি কর্মচারী, ব্যবসায়ী। ভিয়েৎনামের মানুষ। আমাদের পিতৃভূমি ভিয়েৎনাম আজ বিদেশী শাসকের হাতে শৃঙ্খলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। এই শৃঙ্খল, লাঞ্ছনা আর অপমানের প্রতিকার আমরা করবোই। আমাদের বুকের আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব পশুশক্তির লোলুপ লিপ্সা।

ভিয়েৎনামের মানুষ, ওঠো, জাগো !

বলেছিলেন, আমার দেশই আমার দল। আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। ভিয়েৎনামের বন্ধন মুক্তি। ভিয়েৎনামের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের চির উৎখাত। যতদিন একজন ফরাসী কিংবা আমেরিকান ভিয়েৎনামের মাটিতে থাকবে ততদিন থামবে না আমাদের সংগ্রাম। সম্পূর্ণ হবে না আমাদের স্বাধীনতা। ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের। সেখানে স্থান নেই কোন বিদেশী হানাদারের।

বলেছেন ভিয়েৎনামের কথা। অবিভক্ত ভিয়েৎনামের। খণ্ডিত ভিয়েৎনামের স্বপ্ন তিনি দেখেননি। তারও প্রকাশ কথায় কাজে। ১৯৬৯র বসন্ত কবিতায় তিনি বলেছেন,

গত বছর ছিল বিজয়ে বিজয়ে ভরা
এ বছর রণাঙ্গণের সমুখ সারি আরও

বড় বড় বিজয়ে শুনিশ্চিত।
স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য
এসো আমরা এমন লড়াই লড়ি
যেন হয়ংকিরা ত্রস্তে পালায়,
আর পুতুলরা যায় গড়াগড়ি।
যোদ্ধারা, দেশবাসীরা। এগিয়ে চলো।
উত্তর ও দক্ষিণ আবার মিলিত হলে,
বসন্ত আরও সুখের হতে পারে।

তাঁর স্বপ্ন সাধনা স্বাধীনতার। সে সাধনার শেষ এখনো আসেনি। আসবে। দেরী নেই, দেরী নেউ, সেদিন আসবেই।

ফরাসী সোস্যালিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ জাতীয় কংগ্রেস সেবার তুর-এ। সময়টা ১৯২০ সাল। ২৫ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ছ'দিন চলেছিল অধিবেশন। অনেক বড় বড় বামপন্থী নেতারা সে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন হো চি মিন। তখন তিনি নগুয়েন আই কুয়োক। ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি।

সে অধিবেশনে লিওঁব্লুম, পলভাইল্যাণ্ট কুয়েতার, ক্লারা জেটনিক, সেমবাটের মত রাজনীতিকরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের চিন্তাশীল আলোচনা করেছিলেন।' সারা পৃথিবীতে সোস্যালিজমের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা।

বুঝি সেই অধিবেশনে যোগ দিয়ে নগুয়েন আই কুয়োকও স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বহেছিল ভিন্নধারায়। বক্তাদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে কখনো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন কখনো সব কিছু ভুলে শিশুর বিস্ময়ে চেয়েছিলেন নেতাদের মুখের দিকে। তাঁর সেই সারল্য মাখা মুখের ছবি, স্বপ্নময় দুটি চোখ কোন সুদূরে যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগুন ঝরেছিল তাঁর

কণ্ঠে। বার বার উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ। সম্মেলনের নাবালক প্রতিনিধিটির মুখের দিকে বিখ্যাত নেতারা কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ শোনবার ইচ্ছা না থাকলেও শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা বুঝি সেদিন ভেবে পাননি দুর্বল শরীর, তোবড়ান গাল, শশ্রুগুম্ফহীন ছোট্ট মানুষটির কণ্ঠে সমুদ্রের গর্জন সম্ভব কেমন করে।

শুধু পরাধীন ভিয়েৎনামের মর্মবেদনা নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমেব জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র নিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন, সাথী! আপনারা আজ বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন দেখায় আমারও বাধা নেই। কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে কোন কাফে বসে আমিও স্বপ্ন দেখতে পারি। সোস্যালিষ্ট দুনিয়ার আনন্দে মশগুল হয়ে নিজেকে একজন ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারি।

কিন্তু আমি তা পারি না। স্বপ্নেব পরিবর্তে দুঃস্বপ্ন আমাকে ঘিরে ধরে থাকে সব সময়। ফ্রান্সের মাটিতে বসে আমি আমার দেশের নাবী শিশু অসহায় মানুষের কান্না শুনতে পাই। বিদেশী শয়তানদের হাতে ধর্ষিতা জননী আমাব অসহায় কান্নায় ডুকরে কাঁদে! পিতৃভূমি ভিয়েৎনাম আমার পরাধীন। আমি একজন সোস্যালিষ্ট হলেও বিশ্ব-বিপ্লরের স্বপ্ন দেখার অধিকার আমার নেই। পরাধীনতার লজ্জা উপেক্ষা করে বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্ন দেখাও আমি অপরাধ মনে করি।

ফ্রান্স আজ ভিয়েৎনামের প্রভু। ছলে বলে কৌশলে সে গ্রাস করেছে ছোট্ট দেশটাকে, তার মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা তার হাতের খেলার পুতুল। পুতুলে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে তার শক্তিদণ্ড আর সীমাহীন অত্যাচারের কাছে। ঘৃণ্যতার খাদকের দল তাদের ইচ্ছামত মানুষগুলোর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তার শিক্ষা সাংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে ইংলিস উপসাগবের জলে। আন্নামী

পর্বতমালার উপর থেকে আছড়ে ফেলে ভেঙে দিতে চাইছে জাতীর মেরুদণ্ডটাই।

তারা মুখে বলছে আমাদের দেশকে উন্নত, জাতিকে জ্ঞানে গুণে গরিমায় মহান করে তুলবে বলেই দখল করেছে। কিন্তু তাদের সদিচ্ছার একটু নমুনা তুলে ধরলেই বুঝতে পারবেন তাদের উদ্দেশ্য কত মহৎ।

আজ ভিয়েৎনামীদের পেটে দুবেলা ক্ষুধার অন্ন জোটে না। যে শিশু জন্ম নিল তার ক্ষুধার সুধাধারা মায়ের বুকে। কিন্তু শিথিল শুষ্ক স্তনে এক ফোঁটা দুধ নেই! মাতৃ-জঠরে সে পুষ্ট হয়নি। জন্মগ্রহণ করেও সে পেলনা ক্ষুধার আহার। দুর্বল প্রাণটুকু নিভে গেল মায়ের বুকে। মায়ের চোখে জল নেই, কণ্ঠে নেই সন্তান হারাণোর হাহাকার। সব শক্তি নিঃশেষিত। আর শিশুর মৃত্যু মাকে কাঁদাল না কিংবা কাঁদতে পারল না কেন জানেন, যে শিশুটির জন্মের পরেই মৃত্যু হল তার জন্মদাতা কে? কার ঔরষে সে ভ্রুণ হয়ে মাতৃ-জঠরে আশ্রয় নিয়েছিল, ভিয়েৎনামী পিতার না একটি কামার্ত ফরাসী পশুর?

মা যে ভুলতে পারেনি দুঃস্বপ্নের সন্ধ্যাটিকে। স্বামী তখনও মাঠ থেকে ফেরেনি। চাষের সময় বহে যাচ্ছে, সময়ের হিসাব এখন চলে না। অন্ধকার নয় আলোর লগ্ন। আকাশে চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলোর রূপালী ধারায় ফসলের স্বপ্ন বুনবে মানুষটি। একলা নয়, সবাই আছে সঙ্গে। নারী পুরুষ মিলে সমানভাবে কাজ করে তারা।

বধূটি অসুস্থ ছিল। দুর্বল শরীর নিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতে সেদিনও সে যেতে চেয়েছিল। রাজি হয়নি স্বামী। বাধ্য হয়েছিল ঘরে থাকতে।

ছোট্ট গৃহ। চাষীর পর্ণকুটীর। রাঙচিতার বেড়ায় ঘেরা স্বপ্নের নীড়। গৃহমধ্যে সুন্দর বেদী। বেদীর উপরে দেবতা রয়েছেন। গৃহস্থের গৃহদেবতা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাতেই বেদীমূলে ধূপ জ্বেলে দিয়েছিল বধূটি। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নত করেছিল মাথা। তারপর আর কিছু মনে ছিল না তার। একবার যেন চিন্তা করতে পেরেছিল সদম্ভ বুটের আওয়াজ তার কানে এসেছিল। স্বামী মাঠ থেকে ফিরে দেখেছিল ধর্ষিতা স্ত্রীকে। তার নগ্ন ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দুর্বল দেহটা পড়ে আছে গৃহদেবতার বেদীর ওপর। ফরাসী প্রভুর দল হয়তো বা কয়েকজনে মিলে কামনা চরিতার্থ করে গেছে একটি ভিয়েৎনামী মেয়ের ওপর। না খেতে পাওয়া অস্থিচর্মসার দেহটা তাদের পশুত্বের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারেনি। তারা চেয়েছিল নারীদেহ। শিশু কিশোরী এমন কি বৃদ্ধা হলেও নিষ্কৃতি নেই। তারা শুধু চায় নারীদেহ।

ভিয়েৎনামীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায়, কিন্তু সে ফসলে তাদের কোন অধিকার নেই। পেটে যদি ক্ষুধা রইলো, নিজের হাতে বোনা ফসলে যদি ছেলেমেয়ে স্ত্রীর মুখে দুটি অন্ন তুলে না দিতে পারলো তাহলে কি হবে মিথ্যা ফসল ফলিয়ে? কাদের জন্যে ফসল বুনবে। গাইবে ফসল কাটার গান?

ফসল বুনতে হয়, মুখ বুজেই কাটতে হয় ফসল। সে ফসল চলে যায় শাসকশ্রেণীর হাতে। যা দেয় সামান্য, তাতে কটা মাসও চলেনা। তবু ফসল না ফলিয়ে উপায় নেই। বেয়নেটের মুখ সবসময় উদ্যত।

ভিয়েৎনামীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। জ্ঞানে গুণে গরিমায় উন্নত হবে। অথচ অনুন্নত সে ছিল না কোনদিন। শতকরা পঁচানব্বইজন পারতো লিখতে পড়তে। এমন একসময় ছিল যে সময় লেখাপড়া না শেখার অপরাধে মানুষকে শাস্তি পেতে হত। কিন্তু দুঃশাসনের দল মানুষের শিক্ষার পাঠ তুলে দিতে চায়। স্কুল কলেজ গড়ার বদলে ওরা গড়ছে জেলখানা। ফরাসী শাসকের দল আজ জেলখানার পাঠ শেখাচ্ছে মানুষকে।

অথচ দেশে আইন আছে। আইনে নিরাপত্তার কথাও বলা

হয়েছে। বলা হয়েছে আইন ভঙ্গকারী সব সময় দণ্ডনীয়। কিন্তু দণ্ডটা নিচ্ছে কারা? নিরীহ শান্তিপ্রিয় ভিয়েৎনামীর দল। কারণ আইনের চোখে তারাই সবসময় দণ্ডনীয় ভূমিকা পালন করে। কারণ বিচারের অধিকার তো তাদের হাতে নেই।

দেশ আমার, আমার দেশে আমি অনধিকারী। আমার দেশের মাটিতে আমি মার খাব বিদেশীর হাতে। কোন প্রতিবাদ করতে পারবো না। পারবো না দস্যুদের শাস্তি দিতে।

কিন্তু কেন? কোন অপরাধে?

আমাদের মুখের গ্রাস ওরা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেবে সমুদ্রের জলে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ওরা পরিণত করবে জেল-খানায়। চোখের সামনে আমাদের মা বোন স্ত্রী-কন্যার ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আমরা চুপ করে থাকবো। ওরা শাসক, আমরা শাসিত। আমার দেশের বুকে বসে ওরা ওদের যা ইচ্ছা তাই করবে। আমরা বন্দী। পরাধীন। ওদের শক্তির মদমত্ততা আমাদের সহ্য করতেই হবে।

না!

সহ্য আমরা করবো না। আজ হয়তো আমরা বাধ্য হচ্ছি ওদের শত অন্যায় অত্যাচাব সহ্য করতে কিন্তু আমি, জানি বিশ্বাস করি পরিবর্তন একদিন আসবেই। দিন বদলের পালায় ভিয়েৎনামের প্রতিটি মানুষ প্রতিশোধ নেবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে আমার আবেদন, নিপীড়িত ভিয়েৎনামের জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা এগিয়ে আসুন। আমাদের পাশে দাঁড়ান। নিন্দা করুন সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার। প্রতিজ্ঞা করুন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য মনোবৃত্তিকে কোনদিন প্রশ্রয় দেবেন না। দুনিয়ার নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণের সহায় হবেন, সাহায্য করবেন। আপানাদের কাছে

আমার, সোস্যালিষ্ট নামের মর্যাদা রেখে আপনাদের নিজেদের কর্তব্য হিসাবে আপনারা এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন।

তবু এ ফরাসী সোস্যালিষ্ট পার্টির অধিবেশনে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন নগুয়েন আই কুয়োক। তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে কুয়েতার, লঙ্গুয়েট আরো অনেকে অনেক কথাই বলেছিলেন। ভিয়েৎনাম আর অনুন্নত দেশের জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ফাইল বন্দী ছিল বড় বড় নেতাদের প্রতিশ্রুতির কথাগুলি। কাজ হয়নি। সাহায্যের হাত এগিয়ে আসেনি ভিয়েৎনামীদের রক্ষায়।

আশায় আশায় থেকেছেন। ঘুরেছেন দ্বারে দ্বারে। কেউ সাহায্য করেনি। বলেনি আমি আছি। আমার হাত তোমার হাতে মিলালাম ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা নিলাম।

গিয়েছিলেন মঃ বাবুতের কাছে। উগ্র সোস্যালিষ্ট ছিলেন তিনি। হ্যানয় থেকে লা পার্টি অন্নামাইট কাগজ বার করতেন। সেই কাগজে বন্ধু ফান চু ত্রিন ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা দাবী করে লিখেছিলেন। ফলে ফরাসী আইন ফান চু ত্রিনকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করল। ফরাসী জেলখানার অন্ধকারে মৃত্যুর দিন গুণতে লাগলো ফান চু ত্রিন।

ছুটে গিয়েছিলেন তিনি মঃ বাবুতের কাছে। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে দরজার কড়া নেড়েছিলেন তাঁর ঘরের। বেরিয়ে এসেছিলেন মঃ বাবুত।

শীর্ণ মূর্তিটার দিকে চেয়েছিলেন মঃ বাবুত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেছিলেন আগন্তুককে। শীতের রাত্রি। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে শার্ট, পায়ে টায়ারের শ্যাণ্ডেল।

মঃ বাবুতের কেমন যেন সন্দেহ জেগেছিল মনে। সন্দেহের দৃষ্টিতেই আগন্তুকের উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ছিলেম। কিন্তু উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। একবার মনে হয়েছিল ভিয়েৎনামী কোন সাহায্য প্রার্থী। কোন দুস্থ মজুর হয়তো। এসেছে সাহায্যের আশায়। তাবা আসে প্রায়ই। তিনি যা পারেন সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্য কবেন। প্রার্থীকে কোন দিন বিমুখ করেন না তিনি।

কিন্তু সে কথা বলতে পারেননি তিনি। বলতে পারেননি, কী চাই ?

বলেছিলেন, কাকে চান ?

মঃ বাবুতকে।

উদ্দেশ্য ?

সাক্ষাৎ।

আমিই বাবুত।

আপনি ?

বিস্ময় যেন তাঁর জন্যেও অপেক্ষা করছিল। শান্ত ধীব স্থিব সৌম্য বাবুতকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনিও।

আপনার নাম ? প্রশ্ন কবেছিলেন মঃ বাবুত।

নগুয়েন আই কুয়োর্ক, মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

নগুয়েন আই কুয়োক। নামটা যেন পরিচিত ঠেকেছিল মঃ বাবুতের কাছে। মনে পড়েছিল তাঁর। তাঁকে বসতে বলেছিলেন ঘবে। নগুয়েন আই কুয়োক! ভিয়েৎনামের মুক্তিকামী একজন।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল!

১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে ভার্সাইতে আরম্ভ হল শান্তি সম্মেলন। আমেরিকা থেকে এলেন প্রেসিডেণ্ট উইলসন। বিশ্ব-রাজনীতিতে তাঁর স্থান তখন অনেক ওপরে। তাঁরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

সম্মেলনে চৌদ্দ দফার এক খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অনেক পরাধীন দেশকে নানা দিক দিয়ে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। প্রয়োজন বোধে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে। দুনিয়ার প্রতিটি দেশ চেয়ে আছে ভার্সাই সম্মেলনের দিকে। চেয়ে আছে প্রেসিডেন্ট উইলসনের মুখের দিকে। কোন কোন দেশ প্রেসিডেন্টকে গোপনে খুশি করবারও চেষ্টা সুরু করেছে।

ফান চু ত্রিন তখন রাজনীতিতে বেশ নাম করেছেন। এক বন্ধু মারফৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন নগুয়েন আই কুযোক। বলেছিলেন, আমি আপনার কাছে কিছু পরামর্শ চাই। সেই জন্যেই এসেছি।

আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব। বলেছিলেন ফান চু ত্রিন। কিন্তু কী বিষয়ে আপনি আমার কাছে পরামর্শ আশা করেন ?

ফরাসী দস্যুর দল অন্যায় ভাবে ভিয়েৎনামকে পরাধীন করে রেখেছে। ভার্সাই সম্মেলনের প্রধান হযে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন আসছেন। আমি ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে দেশের জনগণের তরফ থেকে বক্তব্য রাখতে চাই।

কথাটা শুনে ফান চু ত্রিন নগুয়েন আই কুযোকের মুখের দিকে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করবো ?

আমি যে কার্যসূচী উইলসনের কাছে পেশ করবো তা রচনা করতে আপনার সাহায্য চাই।

আপনি কী কিছু স্থির করেছেন ?

নিশ্চই।

বলুন।

বলেছিলেন তিনি। কিছু পছন্দ, কিছু অপছন্দ হয়েছিল ফান চু ত্রিনের। আলোচনা চলেছিলে, তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। শেষে

তাঁরা একমত হয়ে কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। আট দফা দাবীর খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা। যথা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, লবণ কর, ফরাসী ও ভিয়েৎনামীদের সমান অধিকার, বাধ্যতামূলক শ্রম, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও বাধ্যতামূলক মদ খাওয়া বাতিল করা হোক।

তর্ক-বিতর্ক • আলোচনা, অনেক দিনরাত্রির চিন্তার পর যে খসড়া তৈরী হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত উইলসনের হাতে গিয়ে পৌঁছায়নি। অনেক চেষ্টা করেছেন। বার বার গেছেন আর ফিরে এসেছেন। পাহারাদারের দল ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁকে। পাগল বলে উপহাস করেছে। কখনো বা মৃত্নু গলা ধাক্কা দিয়েছে।

অপমান! না-না অপমান কিসের? ওরা তো ঠিকই করেছে। ওদের দায়িত্ব পালন করেছে ওরা।

জ্বালা ধরেছে বুকে। বেদনাব অশ্রু জমেছে চোখের কোলে। পরাধীনতাব গ্লানি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। প্রতীজ্ঞা করেছেন মনে মনে। নীরব প্রতীজ্ঞায় ফুলে উঠেছে বুক। জ্বলে উঠেছে বুক, জ্বলে উঠেছে চোখেব তুই শান্ত তারা।

৩নং রিউ ডুপার্সে'র দোতলাব ঘবে বসে ক্রুদ্ধ গর্জনে গর্জেছেন তিনি দিন রাত্রি। আর মনে মনে বলেছেন, এ তুনিয়ায় পরাধীন যারা তাদের কোন মূল্য নেই। পৃথিবীতে আত্ম অধিকার হারা মানুষের বেঁচে থাকা না-থাকা তুই সমান।

ভিয়েৎনামের মানুষ। যাঁরা তখন দেশ থেকে ফ্রান্সে আসতেন, এসে দেখা কবতেন তাঁর সঙ্গে। একদিন তাঁর আক্ষেপ শুনে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা কী তাহলে মরে আছি?

নিশ্চয়! চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল তাঁর। পরাধীনতার বেদনা যাকে দগ্ধ করেনা সে হয় তো মানুষ নয়, নয়তো তার মনুষত্ব বোধটুকু শেষ হয়ে গেছে। মরে গেছে

সে। তার মনের মৃত্যু ঘটেছে। প্রাণের আগুন সেখানে জ্বলবে না।

তিনি বলেছিলেন, আমাদের বাঁচতে হবে। জাগাতে হবে আমাদের আগুনকে, নিভতে আমরা দেব না।

ফান চু ত্রিনের মুখে নগুয়েন আই কুয়োকের কথা শুনেছিলেন মঃ বাবুত। পরিচিত হতে বা আলাপ করতে যে ইচ্ছা ছিলনা— তা নয়, কিন্তু সময়াভাবে সম্ভব হয়ে ওঠেনি সে ইচ্ছা। তারপর ফরাসী আইনের অন্যায় আদেশে ফান চু ত্রিন যখন অন্ধকার কারাগারে মৃত্যুর দিন গোনা স্থুরু করলেন তখন ভুলে গিয়েছিলেন নগুয়েন আই কুয়োকের নামটা।

সে রাত্রে নগুয়েন আই কুয়োক কেন যে তাঁর কাছে এসেছেন শত চিন্তাতেও বুঝতে পারেন নি মঃ বাবুত। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত নীরব ছিলেন উভয়েই। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করেছিলেন মঃ বাবুতই। বলেছিলেন, আপনি কী আমার কাছে শুধুমাত্র সাক্ষাতের জন্যেই এসেছেন?

বাবুতের কথায় তাঁর মুখের দিকে উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে একবার তাকিয়ে ছিলেন নগুয়েন আই কুয়োক। এক টুক্‌বো ম্লান হাসি তাঁর শীর্ণ মুখ খানায় ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিলেন। মাথা নেড়েছিলেন আপন মনেই। যেন অস্বীকার কবেছিলেন কিছু। মৃদু কণ্ঠটা শোনা গিয়েছিল তাঁর, না।

তবে? প্রশ্নটা স্বভাবতই করেছিলেন মঃ বাবুত।

ফান চু ত্রিন আমার বন্ধু ছিলেন।

জানি।

তিনি হয়তো বিশ্বাস করেছিলেন স্বাধীনতার দাবী জনমত গঠন করতে পারলেই আদায় হবে।

নিশ্চই হবে।

কী জানি।

সত্যই তিনি জানতেন না। কখনো বিশ্বাস করেছেন ভিয়েৎনামে অন্যায় ফরাসী শাসনেব বিরুদ্ধে বিশ্বেব মানুষকে জাগালেই তারা একদিন না একদিন দেশ ছেড়ে সবে আসতে বাধ্য হবে। কখনো মনে হত মিথ্যা ভুল। স্বার্থপব শয়তানেব দল অত সহজে নতিস্বীকার কববে না। ভিয়েৎনামীদেব বক্তেব স্বাদ-ভোলা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। যে দেশের মাটি তাবা অধিকার করেছে, যে দেশেব মানুষগুলো তাদের মর্জির ওপব বেঁচে আছে, সে দেশের মাটিব অধিকার, মানুষগুলোর মুক্তি কী অত সহজে দেওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদের নীতি শাসন ও শোষণ। শত শোষণে যে দেশের বুকের সম্পদ নিঃশেষ হয়না, মানুষগুলো মরে, তবু স্বীকাব কবেনা প্রভুত্ব, সে দেশকে নিষ্কৃতি দিয়ে বোকামী করা সভ্য সংস্কৃতিবান দেশের পক্ষে লজ্জাকর।

ভিয়েৎনামের মুক্তি নেই।

ফ্রান্স তার পায়েব তলায় চিবকাল ভিয়েৎনামকে দমিয়ে রাখবেই।

কিন্তু তা কী হয়? হয় না। হয়নি কোথাও। যদি হোত তাহলে ইতিহাস থেমে থাকতো। শত শত শহীদেব বুকেব রক্তে স্বাধীনতাব যজ্ঞাহুতিব বক্ত চন্দনেব ফোঁটা আঁকা হোত না বুভুক্ষা ধরিত্রীব কপালে। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদেব বক্তাক্ত থাবায় শেষ হয়ে যেত পৃথিবীর চলাব গতি। দেশভক্ত স্বাধীনতাকামী বীবেব দল পবিণত হোত মেষ শাবকে। মা তাব সন্তানের কপালে বিদায় টিকা এঁকে দিয়ে বলতে পাবতেন না, তুমি আমাব নও, তুমি দেশের সন্তান। যে দেশ আজ বর্বর দস্যুব দল তাদেব ক্ষমতাব দম্ভে কেড়ে নিয়েছে জোর করে। আমাদের সোনাব সংসার করেছে ছারখার, আমাদেব সুখের সংসার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে করেছে কলুষিত। আমার ধর্মরক্ষা

নয়, দেশের মুক্তি—শতশত নিপীড়িতা অত্যাচারীতা, ধর্ষিতা মায়ের ধর্মরক্ষা করো। ব্যর্থ হয়োনা। পরাজয়ের গ্লানি সারা অঙ্গে মেখে ফিরে এসোনা কোনদিন। আসবে সেদিন, যেদিন সব শত্রু শেষ হবে দেশের বুক থেকে। শত্রুব বুকের রক্তে স্বাধীনতার হোলি খেলবে মানুষ। যদি সেদিন আসে তবেই ফিরে এসো আমার বুকে। আমি তোমাকে সন্তান বলে বুকে টেনে নেব। যদি না পার, এসোনা। আমি পরাজিতের মা হতে চাই না। আমি ভুলতে চাই গর্ভযন্ত্রণা। গর্বে আমার বুক ভরিয়ে দিও তুমি। দেশ মাতৃকার নামে মৃত্যুকে কোর আলিঙ্গন। আমার সন্তান, মাটির সন্তান হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো মাটিব বুকে বিদেশী শত্রুর একজনকেও শেষ করে।

পথের সন্ধান করতেন তিনি। আলো। কোন পথে মুক্তি। আমার পিতৃভূমির স্বাধীনতা। ভিয়েৎনামেব মুক্তি!

কোন সে পথ? হোক না কাঁটায় ভরা, অন্ধকাবের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আমি পথ চাই। পথের সন্ধান। দিক নির্ণয়ের অসহায় মুহূর্ত থেকে মুক্তি চাই।

আমি ভিয়েৎনামের আকাশে স্বাধীনতার উদয় সূর্যের বন্দনা গাইবো।

আমি আলো চাই। একটু আলো।

আলোর সন্ধান, মুক্তিপথের সন্ধানেই একদিন সায়গন থেকেই যাত্রা সুরু।

নগুয়েন থান থাট্ নয়, বাচ্চা চাকর 'বা'। ফরাসী জাহাজ 'লা টুশ ট্রেভিলের' প্রধান বাবুর্চির সহকারী। সময়টা ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

জাহাজটা যাতায়াত করে হাইফং থেকে মার্সাই। যাত্রীরা সকলেই ফরাসী। অধিকার নেই কোন ভিয়েৎনামীর সে জাহাজে যাত্রী হওয়ার। তবু তারাও 'লা টুশ ট্রেভিলে' উঠতে পারে। ফরাসীদের সেবা করার অধিকার যে একমাত্র তাদেরই।

বা সে অধিকার অর্জন করলো। জাহাজের ক্যাপ্টেন নয়, প্রধান বাবুর্চির দয়াতেই চাকুরীটা জুটলো তার। জাহাজ ছাড়তে আর একটি রাত মাত্র বাকী, বাবুর্চির প্রধান সরকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বন্ধুদের কাছে খোঁজ পেয়ে চাকুরীর আবেদন নিয়ে এগিয়ে গেল নগুয়েন থান থাট্।

জাহাজে চাকরী হল। সুরু হল সমুদ্র যাত্রা। ফরাসীদের সংস্পর্শে এল বা। তাদেব মুখেই শুনতে পেল ভিয়েৎনামের মাটিতে তাদের অনেক কীর্তি কাহিনীর কথা। বাড়ি ফেরাব আনন্দে আর মদের নেশায় তারা হারিয়ে ফেলতো কথা বলার মাত্রা জ্ঞান। তর্কের ঝড় উঠতো। একে অন্যের চেয়ে নিজেকে একজন আদর্শ ফরাসী বলে প্রমাণ করতে চাইতো। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং আদর্শ ভিয়েৎনামের মাটিতে ভিয়েৎনামী মেয়েদের দেহ, ভিয়েৎনামী পুরুষদের জীবন নিয়ে মহত্ব প্রকাশ।

শুনতো বা। শুনতো আর শিউরে শিউরে উঠতো। মনে মনে ভাবতো এরা কী মানুষ, না মানুষের চামড়ার আবরণে কোন পশু? বুঝতে পারতো না।

ভাবতো আজ যা ভিয়েৎনামে হচ্ছে, ভিয়েৎনামীদের নিয়ে যে নারকীয় লীলায় এরা শয়তানের দোসর হয়ে ক্ষমতার মদ মত্ততায় বিসর্জন দিয়েছে বিবেক আর মনুষত্ব, যদি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ওদের নিজেদের দেশে-ঘরে? যদি কোন শক্তি অধিকার করে ফ্রান্সের মাটি। ওদের যে রাইফেল কোন ভিয়েৎনামীর বুককে ঝাঁঝরা করে দেয়, সেই রাইফেল যদি ওদের বুকেই লক্ষ্য স্থির করে, যেমন ভাবে আনন্দ উল্লাসে কোন ভিয়েৎনামী মেয়ের নগ্ন দেহকে তাড়া করে উল্লাসে ফেটে পড়ে ওরা, ঠিক তেমনি ভাবে ফ্রান্সের প্রকাশ্য রাস্তায় কোন ফরাসী মাদামকে যদি অত্যাচারের ভয়ে ভীতা হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখে তখন কী করবে ওরা?

ওরা কী ভেবেছে সে কথা?

তেমন সম্ভাবনার কথা কী কোনদিন উঁকি দেয়নি ওদের মনে? কোন ভিয়েৎনামী মেয়েকে অত্যাচার করার আগের মুহূর্তে একটি বারের জন্যেও ওদের মনে পড়েনি নিজের দেশের মা বোন স্ত্রী কন্যার কথা?

ওরা সভ্য। ওদেব সভ্যতার বিকাশ দেশের শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে। ওরা জ্ঞানী গুণীর দল। পৃথিবীর সভ্য জাতির একটি। ওদের সেই সভ্যতার প্রকাশ ভিয়েৎনামেব মাটিতে।

ওরা গর্ব করে। ওদের গর্বের সংগত কারণ আছে। সভ্যতাই যে পশুশক্তির বিকাশ ঘটায়। পৃথিবীব সভ্যতা আজ শয়তানীর নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশে।

বা-ও ভাবতো। অনিদ্রিত চোখে রাতের তারা জ্বালা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক অসম্ভব কল্পনায় ভবে উঠতো

তার মনটা। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার দুর্জয় প্রতীজ্ঞা নিত মনে মনে।

মনে মনে বলতো আমি আন্নামী, আমি ভিয়েৎনামী। পরাধীন দেশের একজন মানুষ। অথচ মানুষের অধিকার হারা। সেই অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। শয়তানদের অন্যায় অত্যাচার আর অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। শান্তি মৈত্রী প্রেমে ভালবাসায় বুদ্ধের সাধনা। সে সাধনার বিঘ্নকারীদের নিশ্চিহ্ন করে প্রেমের মহান ব্রত উদযাপন করতে হবে মানুষকে।

মনে পড়তো ভাইবোনের কথা। ভাই থিয়েম আর বোন থান। তারা তখন ন্‌ঘে আনে। অনেক দূরে। সেই দূরকে নিকট করতে ইচ্ছা মাঝে মাঝে জাগলেও যেতে পারেনি।

মনে পড়তো বাবার কথা। নগুয়েন মিন হুয়ে।

একদিন ছিলেন সামান্য একজন চাষী। সামান্য একটু জমির অধিকারী। কিন্তু সে জমিতে পেটের ক্ষুধা মিটতো না পরিবারের সকলের। বাধ্য হয়েই সেইজন্যে অপরের জমিতে মজুর খাটতেন। সেই মজুরী খাটার অবকাশে মাকে দেখেছিলেন। ঘর বাঁধার স্বপ্নে প্রতীজ্ঞা করেছিলেন। পূর্ণ হয়েছিল তাঁদের সে প্রতীজ্ঞা। অপরের জমিতে আর নয়, মায়ের বাবা দিয়েছিলেন কিছু জমি। সেই জমিতেই নিজের হাতে সুরু করেছিলেন চাষ।

আর তারই মাঝে চলতো সাধনা। লেখা পড়া শিখতেন তিনি। শিখতেন চীনা চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রামের মানুষকে পরীক্ষা করতেন, ওষুধ দিতেন। আরোগ্য লাভ করত রোগী। নাম ছড়াত। চিকিৎসার জন্যে দূর দূর গ্রাম থেকে ছুটে আসত মানুষ তিনিও তাদের ওষুধ দিতেন কিন্তু পয়সা নিতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা, চিকিৎসাকে তিনি অর্থকরী পেশায় পরিণত করেন নি।

নগুয়েন মিন হুয়ে মানুষের সেবা করেন। বিনা পয়সায় তিনি

রোগীদের ওষুধ দেন। মানুষের বন্ধু তিনি। সাধারণ মানুষ বড্ড বাধ্য তাঁর।

ফরাসী সরকারের টনক নড়লো। গোয়েন্দা লাগলো তাঁর পেছনে। তাঁর প্রতিটি কাজে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো তারা। তারপর একদিন বিনা বিচারে জাতীয়বাদী বলে চালান করে দিল পুলো কোঁদার দ্বীপে। মুক্তি দেবার পরও তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সায়গনে তাঁর বাড়ীতে। মিশতে দেওয়া হয়নি সাধারণ মানুষের সঙ্গে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একা একা কাটাতে হয়েছিল তাঁকে।

বা ভাবতো বাবার কথা। মনে পড়তো বাবার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের ছবিটা।

সায়গনে গিয়েছিল সে। ফরাসী পুলিশের চোখ এড়িয়ে দেখা করেছিল বাবার সঙ্গে। বাবা বলেছিলেন, তুমি?

আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কিন্তু আমার সঙ্গে কারো দেখা হওয়া যে নিষেধ তা কী জাননা?

সব জেনেই আমি এসেছি। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন সে।

কেন?

হয়তো জীবনে আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না সেই জন্যে।

তুমি কী ...

আমি ভিয়েৎনাম ছেড়ে চলে যাব।

কোথায়?

তা জানি না। ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড যেখানে হোক।

সেখানে গিয়ে কী করবে তুমি?

বিপ্লব।

বিপ্লব! যেন চমকে উঠেছিলেন নগুয়েন মিন হুয়ে। রোগা

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে যেন বিশ্বাস করতে পারেননি কথাটা। বলেছিলেন, দেশে থেকে কী পারনা তা ?

কেউ পারছে না। দেশের প্রতি ভালবাসার কথা জানতে পারলেই ওরা আমাদের শাস্তি দিচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রস্তুতিকে শেষ করে দিচ্ছে। সেই জন্যেই আমি দেশের বাইরে যেতে চাই। দেশের বাইরে গিয়ে আমি বিপ্লব সুরু করবো। যদি স্বার্থক কোন দিন হতে পারি তবেই ফিরবো, নচেৎ নয়।

কোন পথে তুমি এগুবে ? জানতে চেয়েছিলেন বাবা।

জানি না। পরাধীনতার আবর্তে পড়ে পথের সন্ধান পাচ্ছি না। সেই জন্যেই বাইরে যেতে চাই।

কিন্তু তুমি যে একা।

আজ একা কিন্তু নিশ্চয়ই একদিন একা থাকবো না। সেদিন আমরা হবো, আমাদের দেশ, সমস্ত ভিয়েৎনামের মানুষ, আমিও তাদের মধ্যে একজন থাকবো।

যাত্রা সুরু।

একলা পথের পথিক, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার মুক্তি যোদ্ধা 'লা টুশ ট্রেভিলে' যাত্রা সুরু করলেন। দেশে ফেরার আনন্দে মশগুল মাতাল ফরাসী সৈনিকের মুখে শুনলেন অত্যাচারের কাহিনী। ওরা আনন্দে বাজী ধরতে লাগলো একে অপরের সঙ্গে।

মঁশিয়ে আপনি আমার থেকে নিশ্চয়ই সার্থক নন। এক রাত্রে একই পরিবারের তিনটি হলদে নারীদেহ আমি উপভোগ করেছি।

বন্ধু, আপনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান। আপনার সার্থকতাকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আমিও কম সৌভাগ্যের অধিকাবী নই। যদিও আমি একই সন্ধ্যায় মাত্র দুটি ভিয়েৎনামী নারীকে ভোগের জন্যে পেয়েছিলাম কিন্তু তাবা ছিল মা এবং মেয়ে। মেয়েটি মায়ের

প্রথম ও একমাত্র সন্তান। মেয়েটির বয়স ছিল বছর বারো এবং মায়ের ছাব্বিশ কী সাতাশ। হ্যাঁ বন্ধু, মা এবং মেয়ে একই ঘরে ছিল। বাইরে পাহারায় ছিল আমার সৈন্যরা। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল আমাকে রক্ষার। প্রথমে মা এবং মেয়েটিকে আমি·ভোগ, এবং আমার সৈন্যরা যখন মেয়েটিকে ভোগ করছিল তখন আমি মাকে আহার্য প্রস্তুত করতে বলি। আহার্য্য গ্রহণের শেষে আমরা মা এবং মেয়ে দুইজনকেই শেষ করে দিয়ে ফিরে আসি। আর হ্যাঁ, বন্ধু, আপনি আমাকে আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে ক্ষমা করবেন। একটি কথা জানতে ভুলে গিয়াছিলাম আমি। মেয়েটির পিতা এবং মেয়েটির মায়ের তিরিশ বছরের স্বামী আমার সৈন্যদেব একজনেব হেপাজতে ছিল এবং আমার বিনা অনুমতিতেই আসার সৈন্যটি চলে আমার সময় স্বামীর মাথাটি রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে ফাটিয়ে দিয়ে এসেছিল।

শুনতেন তিনি। দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিটি কথা কান দিয়ে শুনতেন।

হয়তো কখনো কোন ফরাসীব চোখে পড়ে যেতেন। কাছে ডেকে বলতো, কী শুনছিলি রে?

আপনাদের কথা মঁশিয়ে!

কেন?

আমার শুনতে খুব ভাল লাগে।

ভাল লাগে?

ভীষণ।

হয়তো বিশ্বাস হোত না ফরাসী সৈন্যদেব কোন ক্যাপ্টেনের। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকতো রোগা মুখখানার দুটো উজ্জ্বল চোখের দিকে। একি সম্ভব? মাতালের মনেও সন্দেহ জাগতো।

ছেলেটা বলতো, আমি আপনাদের মুখেই সব শুনতে চাই।

বুকে জ্বলতো আগুন। প্রতিশোধেব আগুন, প্রতিহিংসার আগুন, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল না বাইরে। শান্ত ধীর অসহায়

একটা ভিয়েৎনামী ছেলে। ইচ্ছা করলে সে ছেলেটা মাংস কাটা দা দিয়ে দু একটি নরপশুকে শেষ করতে পারতো। কিন্তু দু একটি পশুর রক্তে কী হবে। কতটুকু লাভ তাতে? কোন লাভ নেই।

হাজার হাজার নরপশু যেখানে ভিয়েৎনামের বুকের রক্তমাংস খাচ্ছে সেখানে দু'একজনকে মেরে কোন লাভ হবে না। আঘাত হানতে হবে মূলে। উৎখাত করতে হবে সমূলে। ভিয়েৎনামের মাটির বুক থেকে মুছে দিতে হবে ফরাসীদের নাম। তাদের বুকের পাঁজরে এমন আঘাত হানতে হবে যে আঘাতের যন্ত্রণা তারা জীবনে কোনদিন ভুলতে না পারে। অন্য কোন শান্তির সংসারে হাত না বাড়াতে পারে। তাদের লোভের থাবা চিরদিনের মত দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে? কোন পথে?

কেমন করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের চিতাশয্যা রচনা করবেন?

কেমন করে?

বন্দরে বন্দরে ঘোরার দিন একদিন শেষ করলেন বা। প্যারিস নয় লণ্ডনে চলে এলেন তিনি। আলো আঁধারে ভরা লণ্ডনের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন নতুন আগন্তুক।

আশ্রয় পাওয়া গেল একটা। এবাব একটা চাকুরী চাই। চাকুরী জুটলো ভিয়েৎনামী তরুণের। পথ পরিস্কারের কাজ। শীতের লণ্ডনের পথ পবিস্কার করতে হবে। পথচারীদের চলার পথের বরফ সাফ করার কাজ।

সেই কাজই করলেন কিছুদিন। কিন্তু শীত শেষ হয়ে গ্রীষ্ম আসার আগেই অপটু শরীরটা কাহিল হয়ে পড়লো। বাধ্য হয়ে চাকুরী ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু চাকুরী একটা চাই। কাজ যদি না জোটে জুটবে অনাহার। কাজ জুটলো। হোটেলে হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ।

আর এই বাসন ধোয়ার কাজ করতে করতেই একদিন নতুন এক সৌভাগ্য, এসে ধরা দিল। লণ্ডনের বিখ্যাত হোটেল কার্লটনের আরো বিখ্যাত বাবুর্চি এস্কোফায়ারের সহকারী হয়ে গেলেন।

দিন যায়। কার্লটন হোটেলে এস্কোফায়ারের কাজে সাহায্য করেন আর পথ খোঁজেন। মুক্তিপথ। ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার পথ। বুকের মধ্যে জ্বলে আগুন। অত্যাচারের জ্বালায় দগ্ধ প্রাণটা যন্ত্রণায় ছটফট্ করে।

মুক্তি চাই—মুক্তি!

ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা।

চাই পথ।

ছুটে যান লণ্ডনের শ্রমিক এলাকায়। জাহাজী বন্ধু শ্রমিকদের সঙ্গে ঘোরেন। নাম লেখান শ্রমিক সংগঠন লাও ডাং হাই নগোয়াইয়ে।

কিন্তু লাভ কিছু হয় না। তিনি চান ভিয়েৎনামের মুক্তি। ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাব স্বপ্ন দেখেন। আব জাহাজী শ্রমিক সংগঠন লাও ডাং হাই নগোয়াই শুধুমাত্র তাদের নিজেদেব স্বার্থেই পরিচালিত হয়। আন্দোলন করে নিজেদেব মজুরী বাডায তারা। সেখানে ভিয়েৎনামের স্বার্থ, তার মুক্তি এসবের কোন স্থান নেই। ভিয়েৎনামের কথা শুনে চুপ করে থাকে জাহাজী শ্রমিক বন্ধুরা।

ছুটে যান ছুটির দিনে লণ্ডনের পার্কেব সভায়। বক্তৃতা শোনেন। বক্তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক নতুন কথা শেখেন। আর কিছু নয়।

পান না পথের সন্ধান। দিন দিন শুধু যন্ত্রণা বাড়ে।

ঠিক এমনি দিনে আয়ার্ল্যাণ্ডে আরম্ভ হল হোমরুলের আন্দোলন।

আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল লণ্ডনেও। লণ্ডনের ফেডিয়ান সোসাইটির নেতারা বসালেন নতুন আসর। সেই আসরের নিয়মিত শ্রোতা তিনি। খবর পেলেই ছুটে যান। মুগ্ধ হয়ে শোনেন তাঁদের বক্তৃতা। শুনতে বড় ভাল লাগে তাঁর। নিজের আগ্রহে পরিচিত হন ফেডিয়ান সোসাইটির নেতাদের সঙ্গে। পড়েন তাঁদের বই। পড়ে শেষ করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের বইও।

একদিন উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। ক্লান্ত বোধ করেন নিজেকে। প্রশ্ন জাগে মনে। যে পথের সন্ধানে তিনি দেশ ছেড়েছেন, যে স্বাধীনতার পথের সন্ধান তাঁর জাগরণের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন, সেই স্বাধীনতা তার পিতৃভূমির কথা একবারও বলেন না ফেডিয়ানরা। ভিয়েৎনামের নিপীড়িত জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা, তাদের ওপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অমানুষিক অত্যাচার ফেডিয়ানদেব মনে এতটুকু রেখাপাত করে না। তারা রাস্তাঘাটে পার্কে ময়দানে বক্তৃতার আসর জমান। কৌতুহলী মানুষগুলিকে বড় বড় কথা বলেন। কথার ফুলঝুরি দিয়ে লাভ করেন হাততালি। ব্যস আর কিছু নয়। আর কিছু চান না তাঁরা। নেতার কর্তব্য পালন করেন মানুষকে ভুলিয়ে।

কিন্তু ভুলতে পারেন না তিনি। ভুলতে পারেন না ভিয়েৎনামকে। যে ভিয়েৎনাম বর্বর পশুশক্তির দ্বারা প্রতিদিন লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছে। যে ভিয়েৎনামের মানুষ সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়ে বলি দিচ্ছে তাদের সুখ স্বপ্ন ভবিষ্যৎ। ভিয়েৎনামের মানুষকে যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে চরিতার্থ করছে কামনা লালসা তাদের তিনি কেমন করে ক্ষমা করবেন। কেমন করে ভুলে থাকতে পারেন দেশ আর মানুষের কথা।

পারেন না। পারা সম্ভব হয়না তাঁর পক্ষে। ভিয়েৎনামের নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ লণ্ডনের বুকে বসে শুনতে পান।

শয়তানদের অত্যাচারে নিহত পুত্রহারা মায়ের করুণ মর্মভেদী আর্তনাদ তাঁর প্রাণে হাহাকার জাগায়। বিনা অপরাধে শৃঙ্খলিত মানুষের তীব্র গর্জন হৃদয়ের গভীরে প্রতিধ্বনি তোলে।

শৃঙ্খল।ঃ পরাধীনতার শৃঙ্খল। যে শৃঙ্খল ওরা. ওই বিদেশী শাসকের দল ক্ষমতার মদমত্ততায় সোনার দেশের মানুষের পায়ে পরিয়ে জহ্লাদের ক্রূব·হিংস্রতায় উপভোগ কবছে আনন্দ, সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ভিয়েৎনামকে জবাব দিতে হবে সভ্যতার ধ্বজাধারীদের। যাবা বলে আমবা সভ্য। শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, গুণে আমাদেব দেশের মানুষ বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসন নিয়েছে। আমাদের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প আজ উন্নত। আমবা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি।

সত্যই শ্রেষ্ঠ জাতি। ওদেব সাদা চামড়ার আবরণে পশুত্বকে লালন কবছে ব্যভিচারে, লালসায়। ওবা দিনেব আলোয় যে কোন মুহূর্তে পবিণত হতে পাবে নবকেব শয়তান রূপে। ওদেব শ্রেষ্ঠতা তুলনাহীন।

ওদের শ্রেষ্ঠত্বকে, পশ্চিমেব শয়তানদের ক্ষমা করবে না ভিয়েৎনাম। তার মানুষ। যে অন্যায় অত্যাচাব ওরা করছে তাব. প্রতিফল ওদেব পেতেই হবে। জবাব দেবে ভিয়েৎনামের মানুষ। কিন্তু কোন পথে ?

পথ চাই, আলো। পাপের ভাবে অন্ধকার পৃথিবীতে এতোটুকু আলো নেই। আলো চাই। পথেব সন্ধান। আমি পথের কাঙাল। আমায় বলে দাও কোন সে পথ ?

হিংসা! সেতো পশুত্বের প্রকাশ। হিংসার পথতো সত্য নয়। তিনি যে বলে গেছেন, অহিংসাই পরমধর্ম। হিংসাকে পরিত্যাগ কর। হিংসার মাধ্যমে মনুষত্বের বিকাশ ঘটে না।

তবে ?

কোন পথে আমি এগিয়ে যাব ? আমাব দেশকে, আমার দেশেব

অগণিত মানুষ, যারা স্বপ্ন দেখেছিল, কামনা করেছিল একখানি শান্তির নীড়, যাদের সে স্বপ্ন কামনা ভালবাসাকে ওরা ওদের হিংস্র থাবায় দলিত পিষ্ট করেছে, বুকের রক্তে সিক্ত করেছে মাটি, মাতৃত্বের মহিমা মণ্ডিত নারী হয়েছে ধর্ষিতা, তারা কি ক্ষমার যোগ্য ? তাদের পশুত্বকে ক্ষমা করা কী মহাপাপ নয় ?

পাপ। নিশ্চয় পাপ। ক্ষমা ওরা পেতে পারে না। ওদের ক্ষমা করা অন্যায়।

আমি ক্ষমা করবো না ওদের। ক্ষমা করবে না ভিয়েৎনামের মানুষ। অত্যাচারীকে ক্ষমা করা দুর্ব্বলতা, ভীরুতা। কিন্তু কোন পথে ? আমি পথ চাই। পথের সন্ধান।

যে পথে আসবে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা।

সেই অগ্নিমন্ত্র আমি কোথায় গেলে পাবো ? কত দূরে ?

১৯১৪ সাল !

বেজে উঠল সাইরেন। যুদ্ধেব দামামা। সুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধ।

এ যেন আর এক দম্ভের প্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদীর দল নিজেদের মধ্যে সুরু করলো .হানাহানি। শক্তি পবীক্ষা সুরু হল নিজেদের মধ্যে। কে বড় ? কাব শক্তি বেশি। কে লাভ করবে শীর্ষস্থান ?

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল। দীর্ঘ চারটে বছর যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। শক্তিমানদের শক্তি পরীক্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ হল সাধারণ মানুষ যারা সহায় সম্বলহীন। অন্ন সংস্থানের জন্যে যাদের দিনরাত্রি পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম না করা ছাড়া যারা বাঁচতে পারে না।

সেইজন্য, অসহায় মানুষদের দুঃখ দুর্দশা যুদ্ধের দৌলতে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল চোখের সামনে। ১৯১৭ সালেব একদিন প্যারিসেব পথে দাঁড়িযে একজন ভিয়েৎনামা মজুরের সঙ্গে একজন ফরাসী মজুরের

মুখের একই সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন তিনি। যেন জেগে উঠলেন। বহুদিনের ভ্রান্ত ধারণার ঘটলো অবসান।

ফরাসী কিংবা ভিয়েৎনামী নয়, খেটে খাওয়া মানুষ, যারা মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে অর্জন করে ক্ষুধার অন্ন, মাথা গোঁজার আচ্ছাদন, তাদের জাত আলাদা। তারা দেশে দেশে আছে কিন্তু তাদের হৃদয়েব তন্ত্রীতে একই সুরের অনুবণন। তারা নিপীড়িত, নির্যাতীত সর্বহাবা। তারা স্বাধীন, কিন্তু ক্ষুধাব যন্ত্রণায় কাতর। তারা চায় আত্ম অধিকার.। তাবা বাঁচতে চায়। একটু সুখ, শান্তি, ভবিষ্যৎ কামনা করে।

নতুন ভাবে কলম ধরলেন তিনি। লিখতেন কবিতা। প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের ক্ষত বিক্ষত যন্ত্রণাব প্রকাশ ঘটতো সে কবিতায়। এবার লিখলেন যাবা রিক্ত, নিঃস্ব অবিচাবের নির্মম পেষণে রক্তাক্ত, ক্ষুধার্ত মানুষেব মর্মগাথা। তুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষেব কোন জাত নেই, তাবা হিংসাব অস্ত্রে মানুষেব বাঁচাব অধিকারকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র আঁটে না। তাবা বাঁচতে চায়। এক হয়ে, একসঙ্গে।

শ্রমিক পল্লীর ঘবে ঘবে ঘুবলেন তিনি। মিশলেন তাদের সঙ্গে। সুখ তুঃখ আনন্দ বেদনায় অংশ নিলেন সমান ভাবে। তাদের একজন হয়ে গেলেন।

প্যারিসের মাটিতে বা হলেন নগুয়েন আই কুয়োক। সুরু হল আর এক জীবন। রাজনৈতিক জীবন। যে দেশ তাঁর পিতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে সেই দেশের বুকে বসেই বুকের আগুনে উত্তপ্ত হাতে লিখলেন মানুষের কথা, অন্যায় অত্যাচারেব বিরুদ্ধে ঘোষণা কবলেন জেহাদ। অন্যায় অসত্যেব বিরুদ্ধে স্পষ্ট কণ্ঠ শোনা গেল্ তাঁর।

চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়লো নাম। সক্রিয় হল প্যাবিসের গোয়েন্দা পুলিশের দল। সতর্ক হল তাবা। তাদের গোপন রিপোর্ট

ভয়ঙ্কর মানুষটিকে নিয়ে রইলো চিন্তিত। খুঁজে ফিরতে লাগলো তারা মানুষটির সন্ধানে।

যে মানুষটিকে নিয়ে পুলিশ মহলে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই সেই মানুষটি কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে বাস করছেন ইমপাসি কম পয়েন্টে। সঙ্গে এক বন্ধু। একই দেশের মানুষ তাঁরা দুজন। একই প্রতীজ্ঞায় দীপ্ত দুটি প্রাণ। জীবন মন্ত্র ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা।

দিনে ফটোগ্রাফারের দোকানে রি-টাচারের কাজ। কখনো বা 'চীনাপুরা দ্রব্যের গায়ে রঙ তুলি দিয়ে নক্সা আকেঁন। সন্ধ্যায় ছুটির পর বাসায় ফিরে বসে রাজনীতির আসর। ভিয়েৎনামের মুক্তি চিন্তা।

বন্ধুরা আসে। তাদের নিয়ে নিত্য মেতে ওঠেন রাজনীতিব আলোচনায়। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষদগার করেন সবাই। নিন্দা করেন।

এমনি নিত্য দিনের আলোচনায় একদিন একটা কথা মনে হয় তাঁদের। কাগজ। একটা কাগজ চাই। তাঁদের নিজস্ব কাগজ। যে কাগজের অধিকারী হবেন তাঁরা। লিখবেন তাঁদের কথা। ভিয়েৎনামের যন্ত্রণার কথা। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মুক্তির হাতিয়ারের প্রয়োজন।

প্রকাশ হল কাগজ। যদিও সে কাগজের পৃষ্ঠা সংখ্যা কম, অনিয়মিত তবু তাঁরা একটি নয় দুটি কাগজ প্রকাশ করলেন। 'ল্য পারিয়া' আর 'ভিয়েৎনামগণ'। আর সে কাগজ শুধু প্যারিসে নয় ভিয়েৎনামের জাহাজী বন্ধুদের মারফৎ পৌছাতে লাগল দেশের মাটিতেও।

পরিচিত হলেন মারিয়ানমুতে, লেয়ঁ ব্লুম, মার্শের কাসাঁ, কার্ল-মার্কসের নাতি জঁা লঙ্গুয়েট আরো অনেকের সঙ্গে। লিখতে সুরু করলেন 'লা হিউম্যানাইট' আর 'লা পপুলার' কাগজে। লিখতে সুরু করলেন আরো অনেক কাগজে।

তাঁর লেখা পড়ে চমকে উলঠ মানুষ। লেখা নয় এ-যে বুকের আগুন। অন্যায় ভাবে পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী করে রাখা ভিয়েৎনামের ক্রুদ্ধ গর্জন। সে যেন ধৈর্য্যের শেষ সীমায় উপনীত। শিকল ছেঁড়ার আর বিলম্ব নেই। অন্যায়ের শিকল সে ছিঁড়বেই।

পুলিশ এলো তাঁর কাছে। নগুয়েন আই কুয়োকের কাছে। সন্ধান পেয়েছে তারা। ক্রুদ্ধ সিংহকে সময় থাকতে বন্দী করবে। দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দেবে তার থাবা।

আপনাব নাম ?

নগুয়েন আই কুয়োক।

আন্নামী

ভিয়েৎনামী।

কী কবেন ? পেশা ?

ফটো বি-টাচাব।

এসব বই, প্রবন্ধ আপনি লিখেছেন ?

নগুয়েন আই কুয়োকেবই লেখা ওগুলো।

আপনাব ?

আমিই লিখেছিলাম।

এখন লেখেন ?

গতকালও জঁা লঙ্গুয়েট সম্পাদিত 'লা পপুলাবে' একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

সেটাও কী আপনাবই লেখা ?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ।! পুলিশ যেন বিব্রত বোধ কবে। বিশ্বাস হয় না। এই তরুণ আন্নামী যুবক নগুয়েন আই কুয়োকই ওই সব ভয়ঙ্কর বাজনৈতিক প্রবন্ধের লেখক বলে।

কেমন যেন খটকা লাগে তাদের। এ হয়তো যুবকের ছলনা। নগুয়েন আই কুয়োকের নামটা নিজের নামে চালাতে চাইছে, বাঁচাতে চাইছে সত্যকার লেখককে। একবার তারা ভাবে ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে গিয়ে সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেয়। কিন্তু কী যেন হয় তাদের। তাদেব অভিজ্ঞ চোখ নকল লেখক বলে ধারণা করে যুবককে। এ কখনো সত্য হতে পারে না।˝ ওই দীন দরিদ্র হতাশার প্রতিমূর্তি রুগ্ন যুবকটি কোন মতেই ভয়ঙ্কর সেই লেখক হতে পারে না। এতো শক্তি ওর নেই। হয়তো কলমই ধরতে জানে না। খবর নিয়ে জেনেছে ফটো রি-টাচার আর চীনাপুরা দ্রব্যের গায়ে রঙ লাগায়। তুলি ধরতে সবাই পারে। রঙ লাগানো অনেক সহজ কাজ। সত্যই যদি যুবক লেখক হয় তাহলে এমন দারিদ্রের মধ্যে বাস করতে যাবে কেন? অভাব কিসেব? যুদ্ধের দরুণ ফ্রান্সের টল টলায়মান অবস্থায় বামপন্থীরা তো সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। তাদের লেখা পড়ছে মানুষ। তাদের কাগজের চাহিদা বাড়ছে দিন দিন।

তাহলে?

উঠে পড়ে পুলিশ। এ নয় অন্য কেউ। তার সন্ধান চাই। তাকে ধরতে হবে। আসল ভ্রমে নকলকে হাজির করলে নকল হয়তো রেহাই পাবে না কিন্তু ভৎর্সনা ভোগ করতে হবে তাদের।

পুলিশ চলে গেলে তিনি জানতে চান, কী হল, আপনারা চলে যাচ্ছেন, আমাকে নিয়ে যাবেন না?

এখন নয়।

কিন্তু আপনারা যাব জন্যে এসেছেন আমিই সেই।

আমরা পরে আসবো।

পরে তারা এসেছিল কী না জানা যায় না। হয়তো এসেছিলো। কিন্তু যাঁর জন্যে এসেছিল তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বন্ধুরা, ফান চু ত্রিন, ফান ভন ট্রুয়ং, নগুয়েন দি ট্রয়েন আরো সব-

অনুরোধ জানিয়ে ছিল তাঁকে। গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। যদিও লুকিয়ে তিনি বেড়ানকে কাপুরুষতা মনে করেছিলেন।

বন্ধুরা বলেছিল, আমাদের অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে।

অন্যায় হলেও ? হাসি মুখেই বন্ধুদের উদ্দেশে প্রশ্নটা করেছিলেন তিনি।

বন্ধুরা হয়তো আঘাত পেয়েছিল মনে, হয়তো অভিমান জেগেছিল, কিন্তু ভয় কম হয়নি। বন্ধুকে হারানোর ভয় নয়। আগুন যদি এখনই নিভে যায় তাহলে ভিয়েৎনামের প্রাণশক্তিকে জাগাবে কে ? বন্ধুর পথে বন্ধু যে তাদের আলোক দূত। প্রাণের আগুনে গোটা জাতীর জীবনে জাগাবে প্রাণস্পন্দন। জাহাজী বন্ধুর দল দেশের বুক থেকে ফিরে বলে গেছে যে সে কথা।

বলল, অন্যায় আর অসত্যকে আমরা ঘৃণা করি। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।

আমারও। হাসলেন তিনি

রাজি হলেন বন্ধুদের অনুরোধে। ফরাসী গোয়েন্দা পুলিশের চোখ এড়াতে গা ঢাকা দিলেন। এই আছেন, এই নেই। চকিত চমক। তাবা পেছনে ঘোবে, সদা সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখে, পথে ঘাটে বাজারে, শ্রমিকদেব ঘিঞ্জি নোংরা বস্তীতে হাফপ্যান্ট, সাদা সার্ট আর পায়ে টায়ারের চটি পরা যুবকটিকে খুঁজে ফেরে, কিন্তু পায়না। ধরা দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় যেন।

কাচের সাশির বাইরে থেকে ফটোগ্রাফারের দোকানে কাজে মগ্ন যুবকটিকে দূর থেকে লক্ষ্য করে তারা। এক মনে মাথা নিচু করে কাজ করছে তো কাজ করছে। দোকানে খদ্দেব আসছে যাচ্ছে। কথা বার্তা বলছে, কিন্তু যুবকটি কাজ করে যাচ্ছে নিজের মনে। কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে কৌতুহল নেই যেন তার।

এক সময় দেখা গেল যুবক তার আসনে নেই। কাজে নিমগ্ন

মূর্তিটা আর দেখা যাচ্ছে না। তারা ভাবল, হয়তো কোন প্রয়োজনে ভিতরে গিয়ে থাকবে। এখুনি এসে বসবে আবার। অপেক্ষায় রইলো তারা।

কিন্তু এক সময় তাদের অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা হল। যুবক তার আসনে এসে বসলো না। সময় হল দোকান বন্ধের।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গা ব্যর্থতা তাদের গ্রাস করেছে।

প্রশ্ন হল, আপনি এ দোকানের মালিক ?

আপনারা ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন যিনি দোকান বন্ধ করছিলেন।

আমরা গোয়েন্দা দপ্তর থেকে……

আমি ম্যানেজার এখানকার।

নগুয়েন আই কুয়োক বলে কেউ কী কাজ করে এখানে ?

করে।

সে কি আজ কাজে এসেছিল ?

কেন আসবে না ? নির্দিষ্ট সময় কাজ করে চলে গেছে।

দোকানের অন্য কোন পথ আছে কী ?

এই একটিই পথ।

সে কী অন্য কিছু করে ? আমরা সংবাদ পেয়েছি সে রাজনীতি করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখে। সে…

আমার জানা নেই।

তাহলে আপনি বলছেন সে ওসব কিছু করে না ?

আমি কিছুই বলছি না, তবে আমার মনে হয় সে যদি অন্য কিছু করতো হয়তো জানলেও জানতে পারতুম। অবশ্য আপনারা যা বলছেন আমি জানতাম না। সেও ওসবের কিছুই বলেনি কো দিন। আপনাদের কথা দিতে পারি এবার তার সম্পর্কে জানার

চেষ্টা করবো   তবে এইটুকু বলতে পারি আপনাদের, সে ভাল কর্মী একজন।

অনেকেই তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতেন না, তিনিও জানান নি। মানুষ কাগজে লেখা পড়েছে। পড়ে চমকে উঠেছে। উত্তপ্ত আগুনের স্পর্শ অনুভব করেছে তাঁর জ্বালাময়ী লেখায়। লেখকের নাম নগুয়েন আই কুয়োক। দেশকে যিনি ভালবাসেন।

কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন একদিন। ধরা পড়ে গেলেন পুলিশ অফিসাব লুই আর নুক্সেব কাছে। ফ্রান্সের জাতীয়বাদী আন্নামীদের ওপর ছিল তাঁব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনিই ধরলেন নগুয়েন আই কুয়োককে।

ফেলিসিয়ান চাল্লাইয়াব। থালেডেস হর্টিকালচাবের অধ্যাপক। ভিয়েৎনামেব স্বাধীনতা কাম্য ছিল তাঁর। ভিয়েৎনামের বন্ধন মুক্তির পক্ষে প্রচার করতেন তিনি। আর সেই জন্যেই পুলিশের ছিল তাঁর গৃহে যাতায়াত।

একদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপকেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন আর নুক্স। দেখা হল নগুয়েন আই কুয়োকের সঙ্গে। প্রকৃত মানুষটি ধরা পড়ে গেল সেবার।

সাক্ষাৎ হল আবার। কদিন পবে। নিজের আগ্র.হই সাক্ষাৎ করলেন আর নুক্স। উদ্দেশ্য নগুয়েক আই কুয়োকেব সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপন কার্য সম্পাদন করা। কিন্তু তাঁর পক্ষে আপন কাজ করা সম্ভব হল না। যুবকের সরল উক্তি, স্বাধীনতার মর্মস্পর্শী আকাঙ্খা অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারকেও বিচলিত করে তুললো। নিজের পথ ভুললেন তিনি। অস্বীকার করতে পারলেন না ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার দাবী। তাঁরই চেষ্টায় ফ্রান্সের উপনিবেশ মন্ত্রী আলবার্ট থারাউটের নির্দেশে তাঁর একান্ত সচিবের সঙ্গে দেখা

করা সম্ভব হল। আলোচনা সভা বসলো কিন্তু ফল হল না কিছুই।

তারপর ১৯১৯ সালেব জানুয়ারীতে ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে সেক্রেটারীর কাছে দাবী পত্র পেশ করলেন।

তারপর ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে ফরাসী সোস্যালিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ জাতীয় কংগ্রেসে ভিয়েৎনামের বন্ধন মুক্তিতে সাহায্যের আবেদন জানালেন। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর আবেদন। শুধু রঙের ঝিলিক। কথার ফুলঝুরি। হাততালির লোভে নেতা সাজা। মোহ মুক্তি ঘটলো। জেগে উঠলেন।

আবার সুরু হল খোঁজার পালা। পথ চাই। ভিয়েৎনামের মুক্তি পথের সন্ধান।

আমি ভুল করেছি। ওদের আমি চিনতে পারিনি। ওদেব নীতি—নীতিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। মানব কল্যাণে ওরা আগ্রহী নয়। মানুষের দুঃখ ব্যথা বন্দীত্বের যন্ত্রনা ওদের প্রাণকে স্পর্শ কবে না। স্বার্থের জঘন্য লিপ্সা ওদের মজ্জায় মজ্জায়। প্রভুত্বের অহমিকা ওদের রক্তে। বন্ধুত্ব ছলনা। মহৎ সাজে। বন্দী ভিয়েৎনামের মুক্তিকামী একটা যুবকের সঙ্গে কদিনের মেলামেশায় দলীয় নীতিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। ওবা শুধু পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়েছে। আর কিছু নয়। কিছু দেওয়ার সাধ্য ওদের নেই। আমার চলাব পথকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিল ওরা।

আমি সত্য পথের পথিক। আমি চাই স্বাধীনতা। দেশের বন্ধন মুক্তি। মানুষের অধিকার।

সে অধিকার আহরণ করতে যদি দুর্গম মরু, অশান্ত সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি অতিক্রম করতে হয়, যদি দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিসর্জন দিতে হয়, আমি দেব। আমি আমার জীবন দিতেও প্রস্তুত।

বিনিময়ে চাই স্বাধীনতা। যে কোন মূল্যে আমার দেশের মাটিকে শত্রু মুক্ত করবোই।

শুধু চাই পথ। পথের সন্ধান।

দিশাহারা নাবিক চায় আলোর সন্ধান। সীমাহীন সমুদ্রের বুকে তটরেখা।

সবুজের স্বপ্ন!

পেয়েছি। আমি পেয়েছি। আমি আমার পথের সন্ধান পেয়েছি। আমি সত্যের সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হয়েছি।

প্রবলেমস্ অফ ন্যাশনালিটি এণ্ড কলোনিয়াল পিপল। লেখকের নাম, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। কাগজটার নাম, লা হিউম্যানাইট।

পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন সেদিন নগুয়েন আই কুয়োক। দীর্ঘ দিনের খুঁজে ফেরায় পরশ পাথর খুঁজে পেল যেন কাঙাল মন। মনের অন্ধকার কোন মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উজ্জ্বল অলোয়। সেই আলোকের পথ ধরে এগিয়ে চললেন তিনি। ধীরে ধীরে। সতর্ক দৃষ্টিতে চোখ মেলে।

লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক।

লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সন্ধান তাঁর সোস্যালিষ্ট পার্টির বন্ধুরাই তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁদের তর্কে বিতর্কে আলোচনায় বার বার উচ্চারিত হোত লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কথা। কারণ তাঁরা তখন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের গোলক ধাঁধাঁয় পথ হারিয়েছেন। একবারও এই সিদ্ধান্তে আসছেন না, বিপ্লব সফল করতে হবে।

যে প্যারিসের মাটিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই প্যারিসের অতীতকে তাঁর মনে পড়েছিল। ১৮৭০ সালে প্যারিস কমিউনের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্যারিস কমিউন ছিল মহান যুগান্তকারী বিপ্লব। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করবার জন্যে সর্বহারার যে প্রচেষ্টা, তারই প্রথম, পৃথিবীব্যাপী গুরুত্ব সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মহড়া ছিল সেদিনের প্যারিস কমিউন।

তারপর ভার্সাই থেকে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে কমিউন যখন পরাজয়ের মুখে, তখন মার্ক্স বলেছিলেন, কমিউন যদি বিনিষ্ট হয়, সংগ্রাম স্থগিত হবে মাত্র। কমিউনের তত্ত্বগুলি চিরন্তন ও অবিনাশী; শ্রমিকশ্রেণী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই তত্ত্বগুলি দেখা দেবে বার বার।

লেনিন দৃঢ়ভাবে বললেন, সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পরগাছা-স্বরূপ, বা ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প পুঁজিতন্ত্র,—পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের চূড়ান্ত পর্ব, অতএব, এটি সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বাহ্ণ। সর্বহারার মুক্তি আসতে পারে একমাত্র বিপ্লবের পথে, ওটি নিশ্চই সংস্কারবাদের পথে আসতে পারে না। উপনিবেশগুলি ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির সর্বহারার মুক্তি-আন্দোলনের মৈত্রী স্থাপন করা উচিৎ; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে সামন্ত ও মুতসুদ্দী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্য বাদীদের মৈত্রীটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারে ওই মৈত্রী; অতএব, ঐ মৈত্রী যে সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবসান ঘটাবে, তা অবশ্যম্ভাবী।

পেয়েছি, পেয়েছি; আমি পথ পেয়েছি; আমার শেষ হয়েছে খোঁজাব।

এবাব এগিয়ে যেতে হবে। দৃঢ় পদক্ষেপে, অচঞ্চল হৃদয়ে। সুরু হবে পথ চলা।

পথ চলার সুরু হল তাঁব। লেনিন এবং মার্ক্সকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চললেন। নাম লেখালেন নতুন করে ফবাসী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে। বললেন,—কমরেড, আপনারা যদি উপনিবেশবাদের বিরোধীতা না করেন, নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণের লড়াইয়ে মদত না দেন—তাহলে কর্তব্য থাকবে অপূর্ণ।

আমি আন্নামী, আমি একজন দেশত্যাগী ভিয়েৎনামী; কিন্তু কেন আমি দেশ ত্যাগ করেছি? আমার শত শত ভিয়েৎনামী ভাইয়েরা

কেন দিনের পর দিন দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ? কোন আশায় ?

ভয়ে। শুধু ভয় নয় ক্ষুধার যন্ত্রণাও সেখানে আছে। অথচ আশ্চর্য কী জানেন, দেশে অন্নের অভাব নেই। প্রকৃতি তার অকৃপণ করুণাধারা ঢেলে দিয়েছে ভিয়েৎনামের মাটিতে। চাষীর সোনার স্বপ্ন ফসলরূপে হাসে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে। কিন্তু অধিকার নেই ভোগের। নেই নিরাপত্তা। সাম্রাজ্যবাদীর দল কঠিন নাগপাশের বন্ধনে ভিয়েৎনামের মানুষের জীবনকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চায়।

নিরাপত্তা কী এখানেও আছে ? এখানেও নেই। আমরা পরাধীন জাতি। ফ্রান্সের মাটিতে পবাধীন কোন ভিয়েৎনামী সম্মান পেতে পারেন না। এর প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। বহুবার চোখে পড়েছে বিদেশেব মাটিতে অসহায় ভিয়েৎনামীর লাঞ্ছনা। একজন ফরাসী শ্রমিকের চেয়ে একজন ভিয়েৎনামী শ্রমিক কম বেতন পায়। অথচ পরিশ্রম সমানভাবেই করতে হয় তাকে।

কেন ?

এই ব্যবধান কেন ? এই ব্যবধান কী দূঢ করা যায় না ? ছুনিয়ার সমস্ত শ্রমিক কী এক নয় ? তাদেব পবিশ্রমেব মূল্য কী একই হওয়া উচিত নয় ?

সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভিয়েৎনামকে শোষণ করা। সেই শোষণের অবাধ ছাড়পত্র তারা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে ভিয়েৎনামের বুকে। আপন দেশের বুকে বসেও তাবা নিষ্কৃতি দিতে চায়না ভিয়েৎনামের মানুষকে।

কিন্তু কেন ? কোন অধিকারে তাবা তাদের এই জঘন্য মনোবৃত্তি চরিতার্থ করছে ? একটা দেশের ভবিষ্যৎ একটা সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ?

তারা তাদেব এই অন্যায় অপরাধের শাস্তি কেন পাবে না ?

ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে প্রায় তিন বছরের মত কেটে গেল। প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন। বক্তৃতা দিলেন পার্কে ময়দানে। বললেন ভিয়েৎনামের কথা। এক স্বপ্নেব দেশের কথা। ধর্ম আব জীবনযাত্রা যেখানে একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়, ধর্ম আর জীবন যেখানে একই সূত্রে গাঁথা।

সুর, ছন্দ ভালবাসা ছিল; ছিল প্রেম, মহত্ব, সেবা। ছিল সবই। আজও হয়ত আছে। কিন্তু সুর নেই। জীবন-বীণার তার কেটে গেছে। যন্ত্রকে যন্ত্রণায় ভরিয়ে দিয়েছে। বাতাসকে করে তুলেছে কলুষিত। সাম্রাজ্যবাদেব বিষাক্ত নিঃশ্বাস আজ অন্ধকার করেছে সূর্যকে। সঙ্গীনেব খোঁচায় রক্তের নদী বইছে ভিয়েৎনামের মাটিতে: আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে শত শত শান্তির নীড়।

অথচ দেশে রাজা আছে। আছে রাজসভা, সভাসদের দল। আন্নামের সিংহাসনে বসে রাজকার্য করেন সম্রাট খাই দিন। ফরাসী মদ আর ভিয়েৎনামী মেয়ে তাঁব দিনরাত্রিব আহার। ফরাসী প্রভুর দল তাঁকে সঙ্ সাজিয়ে রেখে বলেছে, তুমি সাধনা চালিয়ে যাও, মোক্ষলাভ কব; ভিয়েৎনামেব সমস্ত চিন্তা আমরা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলুম। তোমার সাধনার ব্যাঘাত ঘটতে আমরা দেবনা।

তারা তাদের কথা রেখেছে। সম্রাট খাই দিনের সাধনার ব্যাঘাত ঘটার কোন উপায় নেই। দেশের মানুষ চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে চাইলেই তাদের কণ্ঠনালী ছিন্ন করে দেয় তারা। শাস্তি বীনা সাধনা সম্ভব নয়। সম্রাটের শান্তিভঙ্গ হতে দেয়না তারা।

বন্ধুগণ, আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু এই সত্য। আমার জাহাজী বন্ধুরা যারা দেশ থেকে ফেবে তারা ফরাসী

সভ্যতার আরো অনেক চমকপ্রদ বিবরণ দেয়। সেসব কথা শুনলে আপনারা হয়তো আঁতকে শিউরে উঠবেন। আপনাদের স্বীকার করতে কষ্ট হবে। হয়তো বলবেন সত্য নয়।

কিন্তু সত্য। নির্মম সত্য। ফরাসী সভ্যতার বিকাশে কিছুই মিথ্যা হতে পারে না। ভ্রূণ হত্যা একদিন হয়তো সমাজে নিন্দনীয় হবে না আর কিন্তু ওরা গর্ভবতী নারীর পেট চিরে যে প্রাণ পৃথিবীর আলো দেখার স্বপ্ন দেখেছিল সে প্রাণকে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে মুক্তি দিচ্ছে। বলছে, এ তাদের নতুন খেলা।

অত্যাচার শুধুমাত্র অত্যাচার নয়, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে খেলা। পৈশাচিক খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তারা। কিন্তু কতদিন? কতদিন আর এই যন্ত্রণা সহ্য করবে মানুষ?

অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, শক্তির মদ মত্ততায় শয়তানের দল যখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয় তখনই আসে বিপর্যয়। সে বিপর্যয়ের দিন ঘনীভূত। ভিয়েৎনাম জাগছে। এবার মাথা তুলবে সে। তার জাগরণ রোধ করা সাম্রাজ্যবাদী কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব হবে না। সে তার প্রতি-অত্যাচারেব শোধ নেবেই।

ফ্রান্সের মানুষ তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ শোনে। অত্যাচারের কথা শুনে শিউবে ওঠে। তাবা তো এসবেব কিছুই জানেনা। জানতে দেওয়া হয়না তাদের। জানতে দেওয়া হয়না বলতে সরকারের তরফ থেকেও জাতীয় পত্রিকা গুলিতে জানানো হয়না। মাঝে মধ্যে ছিটে ফোঁটা সংবাদ যা ছাপা হয় তা ভিতবের পৃষ্ঠায় অনেক সংবাদের ভীড়ে হারিয়ে যায়। ভিতরের পৃষ্ঠায় সংবাদ গুলিব প্রতি সাধারণ পাঠকের আগ্রহের অভাব দেখা যায়। কারণ তারা জানে ওই সমস্ত সংবাদের খুব বেশি একটা মূল্য নেই।

এছাড়া রাজনৈতিক পত্রিকা যা বেরোয় তার পাঠক সংখ্যা কম না হলেও সাধারণ মানুষ খুব বেশি একটা ধারে কাছে ঘেঁসে না।

তাই ভিয়েৎনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য অত্যাচারের কথা আড়ালেই থেকে যায়। হয়তো তা নয়। হয়তো···।

জীবনের আনন্দোচ্ছল দিনগুলো, স্বাধীনতার সুখ সুবিধা প্রভুত্বের মনোভাব ফ্রান্সের মানুষের মনে ভিয়েৎনামীদের দুঃখ দুর্দশা রেখাপাত করে না। কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়, কিন্তু খুব একটা মিথ্যা বলেও মনে হয়না।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে নগুয়েন থান থাট, বা, নগুয়েন আই কুয়োক, ভুয়ং নন হো চি মিন ফিরে এলেন দেশের মাটিতে। ১৯৪৫, ২রা সেপ্টেম্বর ঘোষনা করলেন ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা। দীর্ঘ আশি বছরের পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত ভিয়েৎনামের অজস্র মুক্ত কণ্ঠ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত।

উৎসবে মেতে উঠল ভিয়েৎনাম। দীর্ঘদিন পরে মানুষ নির্ভয়ে বেরিয়ে এল পথে। স্ত্রী-পুরুষ, কিশোর বালক একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো বুকে। অশ্রুসিক্ত চোখে একটি কথা উচ্চারণ করলো, আমরা স্বাধীন!

হ্যানয়ের বা দিন স্কোয়ার সেদিন মানুষের মেলায় ভরে উঠেছিল। স্বাধীন ভিয়েৎনামের মানুষ তাদেব অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসা বা দিন স্কোয়ারেব মঞ্চে উপবিষ্ট একটি শীর্ণ জ্বলন্ত মূর্তির পায়ে উজাড় করে দিয়েছিল। শুনেছিল তাঁর কথা। শপথ নিয়েছিল নতুন জীবনের।

তারপর উৎসব শেষে ঘরে ফেরার পথে এগিয়ে চলল তারা। কণ্ঠে গান। চোখে নতুন দিনের স্বপ্ন।

হঠাৎ চলার গতি তাদের রুদ্ধ হয়েছিল। ফরাসী সৈন্যদল খ্যাপা কুকুরের মত অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত মানুষগুলির ওপর। গুলীর আঘাতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল তাদের বুকের পাঁজর। হ্যানয়ের রাস্তায় বহে গিয়েছিল রক্তের স্রোত। আহতের

চিৎকার মুমূর্ষুর আর্তনাদে ভরে গিয়েছিল আনন্দোচ্ছল সন্ধ্যার হ্যানয়। ওরা অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়েছিল। ওরা হাসতে হাসতে গুলী চালিয়েছিল। অসহায় মানুষের মৃত্যু ওদের প্রাণে সাড়া জাগিয়ে ছিল। ভঙ্গ করেছিল প্রতিশ্রুতি, আইনকে কলা দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পশুব দল আবার বসিয়ে ছিল তাদের হিংস্র থাবা। রক্তাক্ত করেছিল ভিয়েৎনামের হৃদপিণ্ড। বা দিন স্কোয়ারের সভায় যোগদানকারী লক্ষ লক্ষ নরনারীকে একটি সন্ধ্যায় নির্বিচারে করেছিল হত্যা।

মৃতের সংখ্যা অসংখ্য। আহত যারা ফিরে যেতে পেরেছিল ঘরে তারাও নিস্কৃতি পায়নি। পরদিন ভোরের আগের থেকেই সুরু হয়েছিল তাদের ওপর অত্যাচার।

সেই অত্যাচার আজও থামেনি। দিনের পর দিন সমানে চলছে ভিয়েৎনামের মাটিতে পশ্চিমী পশুশক্তির নির্লজ্জ অত্যাচাব। সেই অত্যাচার যাতে স্তব্ধ না হয় সে জন্যে ভিয়েৎনামকে করেছে বিভক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে কায়েম করেছে ওবা ওদেব নরকখানা।

ফরাসীরা গেছে, এসেছে আমেবিকানরা। ইয়াংকি কুত্তার দল। দেশের যৌবনশক্তি আজ যাদের বিকৃত কুৎসিত। ভোগ আর লালসা। এছাড়া আর যাদের কাম্য কিছু নেই। শুধু দৈহিক ক্ষুধা। এছাড়া আর কিছু চায় না, জানেও না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। দয়াধর্মের মহত্বে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। দেশে দেশে পি. এল চার আশির প্রসারিত করুণা ধারা। দেশেব বুকের কালো মানুষগুলোর জন্যে জীবন পণ। বর্ণ বিদ্বেষের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। নিগ্রোরা আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের ভাই বন্ধু।

জন এফ কেনেডি অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন দেশের কালো মানুষ গুলির জন্যে। স্বীকার করেছিলেন কালো মানুষগুলির অধিকার। তাঁর সেই কালো-প্রীতি মৃত্যু এনে দিয়েছিল তাঁর। আততায়ীর

গুলির আঘাতে উড়ে গিয়েছিল তাঁর মাথার খুলি। স্ত্রীর বুকে লুটিয়ে পড়েছিলেন। রক্তের বন্যা বহে গিয়েছিল যেন।

একটি মানুষের রক্ত! একটি মানুষেব রক্ত দেখে শিউরে উঠেছিল আমেরিকার হাজার হাজার লক্ষ মানুষ। মানবতার হত্যাকারী জহ্লাদের শাস্তির জন্যে গর্জে উঠেছিল তাদের কণ্ঠ।

অথচ কি জন এফ কেনেডি, কি আমেরিকার মানুষ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষেব প্রতি অত্যাচার, তাদের মৃত্যু, রক্তের জন্যে এতটুকু বিচলিত হয়নি। মহান কেনেডির মহত্বের প্রশংসা করেছে তারা। বিশ্ব মানবেব নির্যাতনে তাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি। আমেরিকাব প্রাণ-পুরুষ হাসতে হাসতেই নির্দেশ দিয়েছেন ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যেন চলে।

এর নাম কী যুদ্ধ? পশ্চিমেব চোখে যুদ্ধেব স্বরূপ কী মানুষেব হত্যায়, আত্ম অধিকার হবণে?

আমেরিকার যুদ্ধ মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারাকে যে ভিয়েৎনামী তরুণ বিমান বন্দরে পিস্তলের গুলিতে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল; ব্যর্থ হয়ে ধরা পড়ার পর যখন তার সামবিক আদালতেব বিচাবে শাস্তি হয়েছিল প্রাণদণ্ড, তখন তাকে কি এতটুকু অনুতপ্ত দেখিয়েছিল তাব কাজেব জন্যে? দেখায়নি?

জনসাধারণেব প্রবল আন্দোলনে কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল তাকে। তার বক্তব্য রাখার সুযোগ। মুক্ত করা হয়েছিল তাব কণ্ঠ।

কথা বলেছিল সে। তুলে ধরেছিল প্রশ্ন। একটি ছোট্ট প্রশ্ন।

আমি দোষী। হত্যাকারী। কিন্তু ওরা কী?

ওরা মহান, মহৎ। ওদের মহত্বের তুলনা মেলা ভার। ওদেব মহত্ব আজ সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদ পেতেছে। ওদের দেশের সমরাস্ত্র আজ দেশে দেশে তুলে দিচ্ছে সাহায্য হিসাবে। ওরা

চায় যুদ্ধ। দেশে দেশে ঘরে ঘরে যুদ্ধে মত্ত হও মানুষ। আমরা আছি। হিংসার অস্ত্র তোমাদের অভাব হবে না।

খ্রীষ্টমাসের আনন্দ মুখব লগ্নে শিশু ক্রোড়ে জনসন বলেছেন, ভিয়েৎনামে আমরা শান্তির প্রয়াসী। আমরা শান্তি চাই।

শান্তি চায় জনসনের দল। চায় ভিয়েৎনামের মানুষ মাথা নত করে দাসখত লিখে দিক আমেরিকার পায়ে। বিকিয়ে দিক তাদের সব কিছু

তা কী হয়?

হয়না, হয়নি, হবেও না কোনদিন। ভিয়েৎনাম তার শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু। এ তাদের বাঁচার লড়াই। মানুষের আত্ম অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াই। মনুষত্বেব মৃত্যু তারা পৃথিবীতে ঘটতে দেবেনা। তারা হাজাব বছব যুদ্ধ করেছে, আরো হাজার বছর যুদ্ধ করবে তারা। যুদ্ধবাজদের যুদ্ধের মনোবৃত্তি কঠিন আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবে।

প্রকৃত যুদ্ধ শুরু তাদের ১৯৪৫ সালেব ২রা সেপ্টেম্বর। যেদিন মুক্ত ভিয়েৎনামের আকাশে উঠেছিল স্বাধীন ভিয়েৎনামের জাতীয় পতাকা। লাল জমির ওপর হলুদ তারা। সন্ধ্যার আকাশেব স্বপ্ন শুকতারা।

সেই তারার স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিতে ফরাসী পশুশক্তি বর্বর ক্ষুধায় আর একবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ শান্তি প্রিয় আনন্দোচ্ছল মানুষগুলির ওপর। তাদের গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল শত সহস্র মানুষের বুক। তাদের বেয়নেটের খোঁচায় বিদ্ধ হয়েছিল শিশুর কচি প্রাণ। প্রকাশ্য রাজপথে লুণ্ঠিত হয়েছিল নারীধর্ম। মাতা মেরীকে ওরা কবেছিল ধর্ষিতা। শিশু খ্রীষ্টকে ওরা আছড়ে মেরেছিল পাষাণে। ওদের বর্বরতা হিংস্র পশুকে করেছিল লাঞ্ছিত।

আর সেদিন। সেই ২রা সেপ্টেম্বরের অত্যাচারের দিন সায়গনে

হাজির ছিল ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা। তারা চোখ বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল অন্য দিকে। তারা কিছু দেখেনি। শোনেনি। নিন্দা করেনি ফরাসী বর্বরতার।

কারণ তারা কম্যুনিষ্ট হলেও ফরাসী। মুখে তারা যতই দুনিয়ার বঞ্চিত বুভুক্ষু মানুষের প্রতি সমবেদনায় গলে গিয়ে বড় বড় কথা বলুক না কেন কার্যত দেখা গিয়েছিল ভিন্ন রূপ। তাদের দু-একজন শুধু মাত্র দুঃখ প্রকাশ কবেছিল। বলেছিল, এ ঘটনা বেদনার।

বলেনি, এ অন্যায়, এ অক্ষমনীয়। এর ।বচার চাই।

বিচার চায়নি ভিয়েৎনাম। বিচারের প্রত্যাশা জাগেনি তার মনে। বিচার করেছিল সে নিজে। কারণ সে জেনেছিল, বুঝেছিল, বিচার প্রার্থী হয় দুর্বলের দল। বিচাবেব ফাঁদে জড়িয়ে ধরে শয়তানেরা, ফাদে ফেলে। সে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসা শক্ত। সে ফাঁদ যে গোপন লিপ্সায় তৈরী। বন্ধু সাহায্যকারীর ছদ্মবেশে করে সর্ব্বনাশ। বুঝতে দেয় না। বুঝতে পাবলেও মুক্ত হওয়াব উপায় থাকে না।

ভিয়েৎনাম একা। পৃথিবীতে অন্যায় অসত্যের আবর্জনা নির্মূল করার দায়িত্ব নিয়েছে সে নিজের হাতে তুলে। সে জানে তাকে একলা চলতে হবে। পথ দুর্গম। বন্ধুর পথে বন্ধু নেই। ত'তে কী! সে ভয় পায়নি। কঠিন প্রতীজ্ঞায় দীপ্ত প্রাণে এগিয়ে ে.ছে সে। পৃথিবীর চোখে খুলে দিয়েছে ভণ্ড প্রতারকদেব ভণ্ডামীর মুখোশ।

চিৎকার করে বলেছে, ওরা মানুষ নয়, জহ্লাদ!

সুপ্রভাত!

থমকে দাঁড়িয়েছে ফরাসী পথচারী। কৌতুহলী হয়ে উঠেছে মন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ভিয়েৎনামী যুবকটিব মুখের দিকে। আপনি নিশ্চয়ই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন?

কোন সাহায্য…

বাধা দিয়েছে যুবক। উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠেছে মুখ। ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, না মঁসিয়ে আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

তবে?

আমি আপনার ভ্রমণ-সঙ্গী হতে অভিলাষী। যদি আপত্তি না করেন…

নিশ্চই।

ধন্যবাদ মঁসিয়ে। আপনাকে যে কী বলে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যি, প্যারীর পথে প্রাতঃভ্রমণ যে এমন আনন্দদায়ক আমার জানা ছিল না। আপনি যে আমাকে আপনার ভ্রমণ-সঙ্গী হওয়ার অধিকার দিয়েছেন এর জন্যে আপনাকে আর একবার আমার ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য। আমি একজন ভিয়েৎনামী মঁসিয়ে।

আমি জানি, আপনাকে দেখেই চেনা যায়।

তবু আপনি আমাকে সঙ্গী কবেছেন। আমাকে ঘৃণায় দূরে ঠেলে দেননি। আপনাব ভ্রমণ সঙ্গী হওয়াব আবেদনকে স্পর্দ্ধা বলে মনে করেননি। সত্যি মঁসিয়ে, প্যাবী সত্যি অপরূপ। প্রভাতের আলোয় প্যারীকে আমার স্বর্গরাজ্য বলে মনে হচ্ছে। ওই যে দেখুন, ওই যে শিশুর দল; শ্বেত কপোত নিয়ে খেলা করছে, ওই দেখুন কী সুন্দর দৃশ্য শ্বেত কপোতের দল আব শিশুরা কেমন নির্ভয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। সত্যি মঁসিয়ে, আমার মনে হয় এমন দৃশ্য, অমন আনন্দময় শিশু পরিবেশ একমাত্র প্যারীতেই সম্ভব।

আপনি আগে দেখেননি এমন?

না মঁসিয়ে।

আপনার দেশে?

আমার দেশে ? আবার হেসেছে যুবক। আমার দেশের শিশুরা তো খেলা জানেনা, খেলা করে না তারা।

সেকি, খেলা করে না শিশুরা ?

না, মঁসিয়ে, আমার দেশের শিশুরা খেলতে ভুলে গেছে। তাদের বাবা মা খেলা করতে দেয়না।

শিশুদের খেলতে দেওয়া উচিৎ, না হলে তারা রুগ্ন হয়ে উঠবে।

আমারও তাই মনে হয় মঁসিয়ে। আপনি সত্যি কথাই বলেছেন, শিশুরা যদি তাদের কচি মন নিয়ে আনন্দে, মুক্তিতে, খেলা করতে না পায় তাহলে নিশ্চই তাবা রুগ্ন হবে। আপনাব কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু মঁসিয়ে আমার দেশের শিশুবা তাদের খোলা মন নিয়ে একটু যে ছুটোছুটি করবে, নদীর জলে সাঁতার কাটবে, ধানের ক্ষেতে টকি দিয়ে খেলে বেড়াবে তাব উপায় নেই। তাদের বাবা মা-রা তাদের শিশুদের ঘর থেকে বেরুতেই দেয়না।

না-না এমন ঠিক নয়। এমন করলে শিশু-মন ভেঙ্গে যাবে। জড়তা নেমে আসবে জীবনে। পরে তারা ভবিষ্যৎ নাগরিক হওয়ার পথে বারবার বাধা পাবে।

ঠিক বলেছেন মঁসিয়ে, আপনাব মতের সঙ্গে আমার এতটুকু অমিল নেই। সত্যি এমন শুভদিন, আপনার মত এমন একজন সহৃদয় মানুষের সান্নিধ্যে আসাব সৌভাগ্য আমাব আগে ঘটেনি। ওই দেখুন মঁসিয়ে, শিশুবা নিজেদেব মধ্যে কলহে মেতেছে। ওকি, ওযে মারামারি শুরু করেছে। ওই দেখুন অনেকেই দেখেও হেসে চলে যাচ্ছেন। চলুন—চলুন ওদেব মাবামাবি থামিয়ে দিয়ে আসি।

কোন প্রয়োজন নেই ওরা আপনিই শান্ত হবে।

বলছেন। না-না, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই তো ওদেব বিবাদ মিটে গেল। ওই তো ওবা আবার খেলা শুরু করেছে। আমার দেশে এমন দৃশ্য কিন্তু দেখা যায় না। আমার দেশের শিশুরাও হয়তো তাদের ছোট্ট

জীবনকে এমনি ভাবেই আনন্দে বিবাদে ভরিয়ে তুলতে চায়। তাইনা মঁসিয়ে?

সব শিশুর প্রকৃতি এক।

ঠিক বলেছেন, শিশু প্রকৃতি। কিন্তু আমার দেশের শিশুদের এই প্রকৃতির প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। নিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হয় তাদের।

এ তার বাপ মার অন্যায়।

আমারও তাই মনে হয় মঁসিয়ে। আমিও সেকথা ভাবি। আমার দেশের বাপ-মা তাদের শিশুদের প্রতি বড় অন্যায় করে। আব আমাব দেশের বাপ-মার জন্যে আমার দুঃখও হয়। বড় বোকা। শিশুদের রক্ষা করার সামর্থ্য নেই, তবু অবিচার কবে।

কেন?

কেন কী মঁসিয়ে, ওই যে শিশুরা, যারা তাদের বাপ মায়ের সতর্ক দৃষ্টিকঠিন শাসনকে উপেক্ষা করে বাইবে বেরুতে পারে না; একটু ছুটোছুটি করে খেলতেও পারে না, তাদের যখন ফরাসী সৈন্যরা এসে ঘর থেকে টেনে আনে বাইরে তখন শিশুদের বাপ-মাকে চুপ করে থাকতে হয়। তখন তাদের অনেক কিছুই দেখতে হয়। শিশুদের সঙ্গে সৈন্যরা যখন খেলায় মাতে তখন বোধ হয় তাদেব বাপ মা মুখ ঘুবিয়ে নেয় অন্যদিকে। সে খেলা দেখতে তাদেব সাহস হয়না। তাদের শিশুরা কত সুন্দর খেলা খেলছে তা দেখবার সৌভাগ্য থেকে নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করে। সে খেলা কেমন করে খেলা হয় শুনবেন মঁসিয়ে? সৈন্যরা গোল হয়ে দাঁড়ায়, বৃত্তের আকারে। কখনো একটি করে শিশু কখনো বা সংগৃহীত সবগুলি শিশুকেই সেই বৃত্তের মধ্যে দাঁড় করানো হয়। তারপর সেই শিশুরা যখন বৃত্তের বাইরে ছুটে আসতে চায় পালিয়ে যেতে চায়, তখন সৈন্যদের সঙ্গীন কারো পেট কারো বুক বিদ্ধ করে। কখনো বা

একটি শিশুকে নিয়ে, যে শিশুটির বয়েস মাত্র কয়েক মাস, সেই শিশুটিকে নিয়ে ওরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ভূমি স্পর্শ না করিয়ে সঙ্গীনের ওপরে খেলা করে। শিশুর অবয়ব মুছে গিয়ে যখন একটা মাংসপিণ্ডতে পরিণত হয় তখন ওরা ক্ষান্ত হয়। তারপর সেই শিশুর মায়ের কাছ থেকে আহার্য্য চায়। আহার পেয়ে ওরা পর-পর ক'জন মিলে সেই মৃত শিশুটির মায়ের গর্ভ সঞ্চার করার ব্যবস্থা করে যায়। যাতে শিশুর মা আবার একটি শিশুর জন্ম দিতে পারে।

না না!

হাসে যুবক। ভ্রমণ সঙ্গীর মুখের দিকে একবার চায়। বলে, ওই দেখুন মঁসিয়ে কী সুন্দর সূর্য উঠেছে। কি সুন্দর আলো। পাখিরা কী সুন্দর গান গাইছে। ওই দেখুন, একটি সুন্দরী যুবতী তার উদ্ধত বক্ষকে আরো উদ্ধত করে গর্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। কী সুন্দর লীলায়িত ছন্দ। আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পারি মঁসিয়ে যুবতীটি অনাঘ্রাত যৌবন। ওই দেখুন একটি সৈন্যদের গাড়ি। না, শুধু ড্রাইভার আর একজন ক্যাপ্টেন রয়েছেন। না-না ওই তো যুবতীর কাছে গিয়ে গাড়িটির গতি শ্লথ হচ্ছে। ক্যাপ্টেন নিশ্চই যুবতীটিকে গাড়ির পিছনে তুলে নেবেন। কী আশ্চর্য ক্যাপ্টেন যে যুবতীটির দিকে না চেয়েই চলে গেলেন। আচ্ছা মঁসিয়ে আপনাদের দেশের সৈন্যরা এমন নিরাসক্ত হয়ে গেলেন কবে থেকে? সংবাদটা আমি জানতাম না। কারণ ভিয়েৎনামের পথে সৈন্যরা যদি কোন যুবতী মেয়েকে পায়, যদি সন্ধ্যায় তারা একের অধিক হয়, তাহলেও তারা মেয়েটিকে ধরে। যদি মেয়েটি কোন গর্ভিনী নারী হয় তাহলেও মুক্তি নেই। সৈন্যদের কামনা চরিতার্থ করার অধিকার আছে যে কোন নারীর ওপর। তাই করে তারা। সেই জন্যেই আমার মনে হয়েছিল, আপন দেশে ফরাসী রমণীদেরও বোধহয় সৈন্যদের কামনা চরিতার্থ করতে হয়। এখন দেখছি যা

জেনেছি সত্য নয়। অত্যাচারীতা হয় শুধু ভিয়েৎনামী মেয়েরাই। মায়েদেরও সেখানে মুক্তি দেওয়া হয়না। মায়েরাও সেখানে পশুদের কাছে বলাৎকৃতা হয়।

প্যারিসের পথে যাকে পেলেন তাকেই ডেকে বললেন ভিয়েৎনামের কথা। তাদের প্রতি অত্যাচারের কথা। ফরাসী সৈন্যদের সৈনিকের কর্তব্য পালনের জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরলেন।

কেউ শুনলো, কেউ শুনলো না। তবু তিনি বললেন। ফরাসী সভ্যতার মুখে বার বার চূণকালি মাখালেন। তার ফলে পুলিশের খাতায় নাম লেখা হল বারবার।

'ভিয়েৎনাম হন' আর 'লা পারিয়া' কাগজের প্রতিটি রচনার ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়লো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ভিয়েৎনামের মানুষের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে বার বার গর্জে উঠল কণ্ঠ। বার বার সাবধান করে দিলেন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের।

১৯২২ সালে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবাব জন্যে গেলেন মস্কো। তারপর আবার একবার। ১৯২৪ সালে আবার। সেখান থেকে ১৯২৫ সালে চীনে। ক্যান্টনে সুরু হল নতুন যাত্রা। 'রোড টু রেভোলিউশ্যান'।

'বিপ্লবের পথ'।

১৯২৪ সালের জুনে মস্কোয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের পঞ্চম কংগ্রেসে নতুন একটি নাম নগুয়েন আই কুয়োক। একটি রোগা রোগা দেহের অধিকারী মানুষ, কিন্তু দীপ্ত তেজি চেহারা। কণ্ঠে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ। নির্ভিক বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। লেনিন তখন পরলোকে, ষ্টালিনেব সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়নি কিন্তু সভায় বলতে উঠে অভিযোগ আনলেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ আনলেন পার্টির বিরুদ্ধে। বললেন…

কমরেড, বিপ্লবের বড় বড় কথা আমরা মুখে বলছি অনেক কিন্তু সেই পথে আমবা কতটুকু অগ্রসব হয়েছি? সাম্রাজ্যবাদকে আমরা ঘৃণা কবি, আমরা মনে করি সাম্রাজ্যবাদ মানবতার হত্যাকারী, শোষণের যন্ত্র বিশেষ। সেকথা বলেছেন মার্ক্স, সেই পথে বিশ্বাস করে জয়যুক্ত হয়েছে রাশিয়াব বিপ্লব। সেই কথারই পুনবাবৃত্তি করেছেন, কমরেড লেনিন।

আমিও সেকথা বলি, সেই পথকে বিশ্বাস করে আমাদের পার্টি, কিন্তু উপনিবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমাদেব পার্টি কী করেছে? কিছু করেনি। কিচ্ছু নয়।

আর শুধু কিছু করা নয়, উপনিবেশের কোন সংবাদও রাখে না পার্টি। 'লা হিউম্যানাইট' কাগজ বিপ্লবের মন্ত্র প্রচাব করবে, আন্দোলনকে পরিচালিত করবে সঠিক পথে কিন্তু তা করা হয় না; হয়তো 'লা হিউম্যানাইট'-এর কোন একটি সংখ্যা থেকে দেখা যাবে প্রেমের গল্প কবিতায় পাতা ভরে আছে। আর বিপ্লবের কথা লেখা

হবে বুর্জুয়া কাগজে। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রেমের মন্ত্র যপ করতে করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বাঁধবে গাঁটছড়া।

কমরেড, উপনিবেশে কৃষক বিদ্রোহ আসন্ন। ভিয়েৎনামের মানুষ জেগে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের আঘাত তারা হানবেই। ছিঁড়ে নেবে অত্যাচারীর টুঁটি। ওরাও তৈরী হচ্ছে। রক্তেব বন্যায় ভাসিয়ে দেবে চাষীদের আন্দোলন। চাষীদের এখন অভয় মন্ত্র শোনাতে হবে। সংগ্রামের মনোবল যাতে অটুট থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কাঁধে এখন গুরু দায়িত্ব। সে দায়িত্ব তাদের পালন করতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দায়িত্ব তারা পালন করছে না। সব জেনেও তারা উদাসীন। কেন? দায়িত্ব পালনের কর্তব্য কী তারা পালন করতে চায় না? বিপ্লব কী তাদের কাছে শুধু মাত্র কথার কথা? যা তারা বলে তাকি মিথ্যা?

স্পষ্ট অভিযোগ তুললেন কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে। পেলেন সমর্থন। ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা। সুরু হল আর এক পথে যাত্রা। বিপ্লবের পথে সত্যিকারের যাত্রা সুরু হল।

১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে ক্যাণ্টনে গেলেন। বোরো দিনের মিশনের দোভাষী হলেন তিনি।

তিনি যখন ক্যাণ্টনে গেলেন তখন সেখানকাব ভিয়েৎনামীরা এক অকথ্য নির্যাতনের মধ্যে পড়ে আছে। ইন্দোচায়নার গভর্ণর জেনারেল মঃ মারলিনের গাড়িতে ভিয়েৎনামের এক তরুণ ফাম হং থাই বোমা ফেলে ছিল, একজনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ব করছে সেখানকার সমস্ত ভিয়েৎনামীরা। পুলিশের সব কিছু জুলুম মুখ বুজে সহ্য করছে তারা। কারণ তাদের একজনই যে অপরাধী।

এরই মধ্যে সস্তা আসর বসিয়েছে আর একদল। নাম তাদের টাম টাম জা। দলের নামে নাম। তারা রাতের অন্ধকারে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়। চাঁদা তোলে। বলে, ভয় কী তোমাদের,

আমরা রয়েছি। আমরা আনবো স্বাধীনতা। তোমরা আমাদের শুধু সাহায্য করে যাও।

সাহায্য করে মানুষ। যার যা সাধ্য। বাড়াতে বলে সাহায্যের পরিমাণ। কারণ দুঃসাহসিক অভিযানের অনেক বাধা বিপত্তি। অর্থের প্রয়োজন যে সব থেকে বেশি। অর্থ ভিন্ন অস্ত্র সংগ্রহ হবে কি করে ?

কিন্তু ক্যাণ্টনের মানুষকে সাবধান করেছিল একটি কণ্ঠ। সে কণ্ঠ নগুয়েন আই কুয়োকের।

বললেন, অভিযান আর রাজনীতি এক নয়। বিপ্লবের পথ ভিন্ন। সে বিপ্লবে অংশ নিতে হবে ভিয়েৎনামের প্রতিটি মানুষকে। সে পথের সন্ধানে একাগ্রতা চাই, করতে হবে সাধনা। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে তবেই স্বার্থক হবে স্বপ্ন। স্বাধীন হবে ভিয়েৎনাম। আসবে মুক্তি।

চমকে উঠল মানুষ। মোহমুক্তি ঘটলো যেন তাদেব। ছুটে এল। ক্যাণ্টনের মাটিতে একটি নতুন পার্টির জন্মলগ্নেব শুভ সূচনা হল, ভিয়েৎনাম থান নিয়েন কাচ মাং দং চি হোই। সময় ১৯২৫ সালের জুন মাস। মানুষ সংক্ষেপে বলল, থান নিয়েন।

এই থান নিয়েনই উত্তবকালে নতুন নামে রূপান্তরীত হয়েছিল, ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট পার্টি। সৃষ্টি করেছিল নতুন ইতিহাস ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, ভিয়েৎমিন।

১৯২৫ সালে নতুন পার্টির জন্মেব পর সত্যিকারের কাজ সুরু করে দিলেন তিনি। তাঁর প্রথম দুই শিষ্য হো টাং মাউ এবং লি হং সনকে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি সদস্য করে দিলেন। তারই নির্দেশে শিক্ষা দেওয়া হল কিছু ভিয়েৎনামী যুবকদের। পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করলো তারা। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারের শিক্ষা। সে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে যাবে তারা। ভিয়েৎনামের শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে

ঘুরে বেড়াবে। মানুষের সঙ্গে মিশবে। তাদের সুখ দুঃখ আশা বেদনার অংশভাগি হবে। সেবা-ব্রত হবে তাদের ধর্ম। সেই সঙ্গে দলের আদর্শ প্রচার করবে তারা। বপণ করবে বিপ্লবের বীজ।

তারা প্রশ্ন তুলেছিল। জানতে চেয়েছিল, বিনা রক্তপাতে কী ভিয়েৎনাম স্বাধীন হওয়া সম্ভব? আমরা প্রতিবাদ জানাতে যদি মিছিল করি, দাবী জানাই দেশের মুক্তি, তাহলে কী ও রক্তপায়ী পশুর দল আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে?

বোধহয় যাবে না। বলেছিলেন তিনি।

তাহলে নিরস্ত্র আমরা দেশে ফিরে গিয়ে কী করবো? অস্ত্র ভিন্ন যেখানে স্বাধীনতা সম্ভব নয় সেখানে নিরস্ত্র আমাদের পক্ষে কতটুকু কাজ করা সম্ভব?

সন্দেহ জেগেছিল তাদের মনে। টাম টাম জা দলের স্মৃতি তারা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। যারা বলেছিল অস্ত্রের মুখে আমরা ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা আদায় করে নেব। সেই উদ্দেশেই তারা ইন্দোচায়নার গভর্ণর জেনারেল মঃ মাবলিনের গাড়িতে বোমা ফেলেছিল। নিহত করতে চেয়েছিল তাকে। ধরা পড়ে ফাম হং থাইয়ের হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড।

ঠিক সেই সময় ক্যাণ্টনের ভিয়েৎনামীদের সাবধান করে দিয়েছিল একটি কণ্ঠ। সতর্ক করে বলেছিলেন, ওপথ ঠিক নয়। সাময়িক উত্তেজনা ত্যাগ করে নতুন পথে যাত্রা করতে হবে।

এই কী সেই নতুন পথ? ভিয়েৎনামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে, তাদের সেবা করে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করে কী স্বাধীনতা আসবে?

দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, আসবে। নিশ্চই আসবে। দীর্ঘ দিনের অনাচার অত্যাচারে জর্জরিত, হতাশায় ম্লান ক্ষীণ মানুষগুলোর মনে আগে জাগাতে হবে চেতনা। ভিয়েৎনামের সমস্ত মানুষের মনে

প্রজ্জ্বলিত করতে হবে আগুন। সেই আগুন যতক্ষণ না জ্বালিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে ততোক্ষণ বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। দেহের শক্তির সঙ্গে চাই মনের জোর। ইস্পাতের মত কঠিন করতে হবে মনকে, তবেই না সম্ভব হবে পরাধীনতার শিকল ছেঁড়া।

ভিয়েৎনামের মানুষকে তোমরা বলবে, শুধু আমরা নই, আপনাদেরও প্রয়োজন। আমাদেব মিলিত শক্তিই আনবে স্বাধীনতা। অত্যাচারীর দলকে আঘাত হানাব জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। প্রয়োজনে ঢেলে দিতে হবে বুকের বক্ত। তখন চিন্তা করার সময় থাকবে না, চলবে না ভয় পেলে ; ওদের নির্মম অত্যাচাবের কথা ভাবলে। এখন আপনারা ভাবুন, চিন্তা করুন ; কী চান ? স্বাধীনতা, না বিদেশী শাসকের পায়ের তলায় মাথা নত করে ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকতে ?

আর প্রশ্ন তোলেনি কেউ। তাদেব কাছে সরল হয়েছে উদ্দেশ্য। মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষে ভিয়েৎনামকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন ব্যাপক গণজাগরণ।

সেই জাগরণের পবিত্র কর্তব্য নিয়ে দেশে ফিরে গেছে তারা। মিশে গেছে ভিয়েৎনামের নগরে বন্দরে গ্রামে। মানুষরূপে, সেবকরূপে সুরু করেছে কর্তব্য।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র প্রচাব কবতে একদল গেল দেশে। আর একদলকে তিনি গোপনে ভর্তি করে দিলেন হোয়াম পোং ! স্কুলে। সাহায্য করলেন চৌ এন লাই এব চিয়াং কাই শেক। বোরো দিনও তাঁকে সাহায্য করলেন। লি হং ফং কে পাঠালেন মস্কোয়। সেখানে সেও শিক্ষা নেবে যুদ্ধের কলা কৌশল। সম্মুখ সমর নয়। গেরিলা যুদ্ধ। সম্মুখ সমরে প্রয়োজন সৈন্য অস্ত্র অর্থ। গেরিলাদের প্রয়োজন ক্ষিপ্রগতি, কৌশল আর মনোবল। যদি থাকে তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ধরা দেয়।

দিয়েছিল ধরা। ৯৪১ সালের .০ই ৫.। পাকবোব জঙ্গলে।

সেদিন পাকবোর জঙ্গলে আজকের ভিয়েৎনামী নেতারা সকলেই তাঁর ডাক শুনে এসে জড়ো হয়েছিলেন। ভো নগুয়েন গিয়াপ, হোয়াং ভান থু, ফুং চি কিয়েন, ট্রুয়ং চিন আরো অনেকেই। বসেছিল ইন্দোচায়না কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম অধিবেশ। স্থির হয়েছিল ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রীয় পতাকা, লাল জমির ওপর হলুদ তারা। সহকর্মীরা বলেছিল, আমরা প্রস্তুত, ভিয়েৎনামের মানুষ আমাদের জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। আজ মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা করবে না তারা।

অথচ সেদিন? ১৯২৬ সালে?

প্রতিষ্ঠা করলেন ভিয়েৎনাম থান নিয়েন কাচ মাং দং চি হোই পার্টি। পার্টির মুখপত্রের নাম হল 'থান নিয়েন'। হাতে লেখা পত্রিকা। সেই পত্রিকা বিপ্লবের কোন কথাই লিখল না, পরিবর্তে লিখতে লাগল কিছু নিরীহ ধবণের প্রবন্ধ। ভিয়েৎনামের মানুষের কথা। তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। তাদের প্রতি বিদেশী শাসক শ্রেণীর অত্যাচারেব কথা। তখন কিছু মানুষ তাঁর বিপক্ষে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার সুরু করলো। তুলে ধরলো রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্টদের পঞ্চম কংগ্রেসেব কথা। যেখানে দাঁড়িয়ে সেদিন তিনি বড় গলায় বিপ্লবেব কথা প্রচাব করে ছিলেন। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়ে ভুলিয়ে ছিলেন মানুষকে। লাভ করেছিলেন হাততালি।

আজ তাঁর সেই বিপ্লব কত দূরে? কী করছেন তিনি বিপ্লবের জন্যে? তাঁর দল হঠাৎ বিপ্লবের নামে অমন উদাসীন হয়ে পড়লেন কেন? ভয়ে না সুবিধালাভের আশায়?

ভিয়েৎনামের গদির লোভ তাঁকে পেয়ে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তলে তলে হাত মেলাবাব জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। আর তা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ 'থান নিয়েনে' প্রকাশিত লেখাগুলি।

ভিয়েৎনামীদের জন্যে কুমীরাশ্রু বিসর্জন সুরু করেছে 'থান নিয়েন।'

সত্যই কি তাই?

না সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না। যদি সত্যি হোত তাহলে মিথ্যা হয়ে যেত আজকের ইতিহাস। হয়তো ভিয়েৎনামকে নিয়ে সৃষ্টিই হোত না ইতিহাস।

তার প্রমাণ?

আছে—আছে। ভিয়েৎনামের মানুষ বাব বার প্রমাণ করেছে সে কথা। তারা প্রাণ দিয়েছে কিন্তু একটি কথাও বলেনি। বলেছে, জানি বলবো না। আমাদের মুখ খোলাতে তোমরা পারবে না।

উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ফরাসী সৈন্য। মায়েব বুক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বলেছে, যদি তুমি তোমার শিশুব প্রাণ রক্ষা করতে চাও তাহলে বল, এ গ্রামের কে-কে গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে?

মা নির্বিকার। বুকের মধ্যে সন্তান হাবানোর হাহাকার জেগে উঠেছে। উথলে উঠতে চেয়েছে ক ন্নাব সমুদ্র। তবু কথা বলেনি। শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চায়নি।

এখনো বল। চিৎকাব কবে উঠেছে ওরা।

মা'র কণ্ঠ শোনা গেছে, কী বলবো?

এ গ্রামের কে-কে গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে? কখন তারা এখানে আসে?

গেরিলা ওরা নন, মুক্তি যোদ্ধা।

আমরা জানতে চাই।

যদি না বলি?

তোমার শিশুকে আমরা তোমার চো..খর সামনে আছড়ে

মারবো। তোমার ওপর করবো অত্যাচার। তোমার ঘর জ্বালিয়ে দেব। তোমাকে·· ···

তার বেশি কিছু করার সাধ্য তো তোমাদের নেই।

তুমি বলবে না ?

আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

তোমার শিশুকে তুমি বাঁচাবে না ? তাকে কী তুমি ভালবাস না ?

নিশ্চই ভালবাসি, সন্তানের চেয়ে মায়ের আপন তো আর কিছু নেই ?

তাহলে তুমি বলছো না কেন ?

কেন যে বলছি না তা বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই। সে ক্ষমতাটুকু যদি থাকতো তাহলে আমার সঙ্গে মিথ্যা বাক্যব্যয় না করে তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করতে। তোমরা হয়তো জাননা আমার সন্তানের জীবনেব চেয়েও দেশের মুক্তি অনেক মূল্যবান। আমার একটা শিশু যদি তার জীবনের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতার পথকে এতোটুকু প্রশস্ত করতে পারে, আমি মা হয়ে বলছি তার জন্ম সার্থক।

তাই হয়েছিল্। ওরা ওদের মানবতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল শিশুহত্যায়। শিশুহত্যার বক্ত হাতে মেখে নেচে উঠেছিল পৈশাচিক আনন্দে।

মৃত শিশুর মা তবু কাঁদেনি। হয়তো মনে মনে বলেছিল, এদের এই অত্যাচার কবে শেষ হবে ? কবে মুক্ত হবে ভিয়েৎনাম ?

মুক্ত হয়েছিল ভিয়েৎনাম। সাধনা সফল হয়েছিল তার। মুক্তির আলোয় ভরে উঠেছিল মানুষের মনপ্রাণ।

কিন্তু কদিন ?

কদিন ভিয়েৎনামের মানুষ মুক্তির আলোয় জীবনের যাত্রা পথে

সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে হাঁটতে পেরেছিল ? একটি দিন। একটি পুরো দিনও নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা আবার নির্লজ্জ পশুর মত রক্তের ক্ষুধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল মানুষেব আশা আকাঙ্খা স্বপ্নকে।

আবার শপথ নিয়েছিল ওরা। ভিয়েৎনামের মানুষ। বুঝেছিল পশুশক্তির বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই এখনো শেষ হয়নি। শেষ হবে সেদিন, যেদিন হিংসায় উন্মত্ত পশুগুলোকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে। মানুষের ঘরে ঘরে সেদিন জ্বলে উঠবে সন্ধ্যার প্রদীপ। দিনের প্রার্থনায় সফল হবে প্রেমেব স্বপ্ন।

সেই স্বপ্নকে স্বার্থক কবে তুলতে এগিয়ে চলেছে ভিয়েৎনাম। নির্ভয়ে, নির্ভিক চিত্তে। কারণ সে জানে, বিশ্বাস করে, জয় তাদের সুনিশ্চিত। মানবতাকে হত্যা করার সাধ্য কী ওদের ?

এই সংগ্রামে যদি ভিয়েৎনামেব প্রতিটি মানুষকে আত্ম বলিদান দিতে হয়, দেবে। তবু ক্ষমা করবে না। পশ্চিমী দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র থাবাকে ওরা ভয় করে না।

ভিয়েৎনামের প্রতিটি মানুষ আজ প্রতিজ্ঞায় অটল।

মুক্তি না হলে মৃত্যু শ্রেয়।

মুষ্টিমেয় কজন মিলে বিপ্লব কবতে পাবে না। চাষী মজুররাই বিপ্লব করতে পাবে। সমাজে তাবাই সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত। সংখ্যাতে তারাই বেশি। তাবা নিঃস্ব রিক্ত। একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই তাদেব। অথচ সমস্ত দুনিয়ার মালিক হতে পাবে তারা। তারা তা হবেই, কারণ তাবা যখন লড়াই করতে নামে, তখন লড়াইয়ের শেষ না দেখে তারা থামে না। থামতে তারা পারে না।

চাষী মজদুরদের পার্টি একটাই হতে পারে। সেই পার্টিব উদ্যোগে তারা বিপ্লবকে জয়যুক্ত কবে।

'বোড টু বেভোলিউশ্যান'। বিপ্লবেব পথ।

সেই বিপ্লবেব পথকে প্রশস্ত কবতে ভিয়েৎনামেব গ্রামে নগবে বন্দবে ছড়িয়ে পড়লো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। জবাব দিলেন তিনি নিন্দুকদেব নিন্দাব।

বললেন, আমবা মুষ্টিমেয় কজন যদি ভেবে থাকি আমবা দেশেব স্বাধীনতা ফিবিয়ে আনবো, আমাদেব সংগ্রামে কোন প্রয়োজন নেই সাধাবণ মানুষকে, তাহলে আমবা কিন্তু ভীষণ ভুল কববো। আত্ম অহমিকা বোধ আমাদেব ত্যাগ কবতে হবে। সাধাবণ মানুষেব একজন হতে হবে। তাদেব সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম কবতে হবে। তবেই আমাদেব জয় হবে সুনিশ্চিত।

সেই সঙ্গে দেশে দেশে গড়ে তুললেন সেতুবন্ধন। ভেবেছিলেন ক্যান্টনে বসেই তিনি স্বদেশেব স্বাধীনতাব জন্যে সংগ্রাম কবে যাবেন। ক্যান্টন থেকেই তিনি হাজিব হবেন দেশে।

কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা সফল হল না।

হঠাৎ চৌ এন লাই এবং চিয়াং কাই শেকেব সম্পর্কে ফাটল ধবলো। বন্ধ হল মুখ দেখাদেখি। চিযাং কাই শেকেব কুযো কুযো মিণ্টাং দল চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে শেষ কবে দেওযাব যডযন্ত্রে লিপ্ত হল। একমাত্র কাবণ লোভ। লোভেব পাপে অন্ধ হয়ে উঠলেন চিযাং কাই শেক।

তাবপব ১৯২৭ সালেব একদিন। আব পাঁচটা দিনেব মতই ছিল সে দিনটাও। হঠাৎ দেখা গেল সাংহাই আব ক্যান্টনেব পথে বক্তেব স্রোত। চিয়াং কাই শেকেব কুযো মিণ্টাং সৈন্যবা কম্যুনিষ্ট নিধন যজ্ঞ সুরু কবেছে। চীনেব সমস্ত কম্যুনিষ্টকে তাবা শেষ কবতে চায়।

পব পর কটা দিন চলল ত্রাসেব বাজত্ব পথে মানুষ নেই। দোকানপাট বন্ধ। সাংহাইয়েব বন্দব নিবব নিস্পন্দ। শুধু দেখা যায় দলে দলে কিছু বক্ত পিপাসু মানুষকে। তাদেব কাবো হাতে

আগ্নেয়াস্ত্র কারো বা খোলা তলোয়ার। যাকে তারা কম্যুনিষ্ট সন্দেহ করছে তাকেই হত্যা করছে নির্বিচারে. তাদের প্রতিজ্ঞা চীন থেকে কম্যুনিজম নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

নেপথ্যে অদৃশ্য হাতের কারসাজি। সে হাত মার্কিণীদের। তারা বাধা দেয়নি চৌ এন লাই আর চিয়াং কাই শেকের মিলনে। তারা আপত্তি জানায়নি চীন বিপ্লবে বোরো দিনের সাহায্য করতে আসায়।

শুধু করে গেছে সুযোগের প্রতীক্ষা। সে সুযোগ যখন এল তখন সে সুযোগের সদ্ব্যবহার পুরো মাত্রায় করলো তারা। সাং হাই আর ক্যান্টনে হাজার হাজার কম্যুনিষ্ট নিহত হল কুয়ো মিণ্টাংদের বিশ্বাসঘাতকায়। তারা একসঙ্গে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল তাদের। চিয়াং কাই শেকের মূর্তিটা তাদের চোখে শয়তানের রূপ নিল।

বোরো দিন মস্কো ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নগুয়েন বুঝতে পারলেন সময় থাকতে যদি সরে না যান তাহলে আঘাতটা তাঁর ওপরও এসে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। ভয়ং (নগুয়েন আই কুয়োক তখন ক্যান্টনে এই নামেই পরিচিত হয়েছেন) কে তাঁর সঙ্গে মস্কো ফিরে যেতে বললেন তিনি।

রাজি হলেন না তিনি। বললেন, তিনি এখানেই থাকতে চান। এখানে থেকেই তিনি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে পরিচালিত করতে চান।

স্থির হল বোরো দিন একলাই মস্কো ফিরে যাবেন। যাত্রার দিনও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। অনেকেই আগে থেকে বিদায় জানালেন তাঁকে। তিনিও বিদায় জানিয়ে ফিরে এলেন নিজের আস্তানায়।

কিন্তু বোরো দিনের যাত্রার আগের রাত্রে থান নিয়েনের একজন সহকর্মী চুপি চুপি এসে হাজির হল তাঁর কাছে। বলল, আপনি এখানে থাকবেন না, মস্কো ফিরে যান।

সহকর্মীর কথা শুনে আশ্চর্য হলেন তিনি, জানতে চাইলেন, কেন?

এখানে আপনার থাকা হয়তো নিবাপদ না হতে পারে। কারণ আমি জানতে পেরেছি···

কী জানতে পেরেছো তুমি?

ওরা আপনাকেও হত্যা করতে চায়।

ওরা কারা? চিয়াং কাই শেক?

তিনি কী চান, যে আমাকে সংবাদটা দিয়েছে, সে জানেনা। তবে কুয়ো মিণ্টাংদের কয়েকজন আপনাকে নিয়ে আলোচনা করেছে নিজেদের মধ্যে। অনেকেই একমত হয়েছে। শুনে নিজে কুয়ো মিণ্টাং হয়েও আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেছে। আপনি যেন ক্যাণ্টনে থাকবেন না।

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ তিনি স্থিব গম্ভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন, বলেছিলেন, আমার পক্ষে ক্যাণ্টন ত্যাগ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

কিন্তু···। কী যেন বলতে চেয়েছিল সবাই।

নির্ভিককণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, এখনো আমার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

আমরা তো রইলাম। সহকর্মীব দল জানিয়েছিল সেকথা।

সহকর্মীদের মুখের দিকে চেয়েছিলেন তিনি। তাদের শক্তির ওপর বিশ্বাস জেগেছিল তাঁর। তিনি তাঁব অসমাপ্ত কার্যভার তুলে দিয়েছিলেন তাদের হাতে।

বোরো দিনের মিশনেব সঙ্গে আবাব ফিরে এসেছিলেন মস্কোয়। ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে। কিছুদিন বসে বইলেন চুপচাপ। কোন কাজ নেই, শুধু চিন্তা আব চিন্তা। দেশের স্বাধীনতার চিন্তা। পিতৃভূমিব শৃঙ্খল মোচন। স্বাধীন ভিয়েৎনামেব স্বপ্ন।

এই অস্থিরতার জন্যে মস্কো তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। কাজ

চাই, কাজ। কাজ না হলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। দেশের মুক্তি যজ্ঞেব হোমাগ্নি যে তাঁকেই প্রজ্জ্বলিত কবতে হবে।

১৯২৮ সালেব অক্টোবব। মস্কো থেকে বিদায নিলেন তিনি।

বন্ধুরা জানতে চাইলেন, কোথায যাবেন?

জানি না। উদাস কণ্ঠে উত্তব দিলেন তিনি।

সত্যই জানতেন না কোথায় যাবেন। কত দূবেব সে পথ। পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কী না। তবু তিনি যাত্রা কবলেন। একলা পথিক পৃথিবীব জনাবণ্যে মিশে যেতে চাইলেন। কাজের জন্যে ছটফট কবতে লাগলো তাঁব প্রাণটা।

১৯২৮ সালেব নভেম্ববে এসে পৌঁছলেন থাইল্যাণ্ডে। থাইল্যাণ্ডেব বাজধানী ব্যাংককে পৌঁছে যাত্রাব বিবতি ঘটালেন তিনি। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন বৌদ্ধেব চবণে।

বৌদ্ধদের লীলাক্ষেত্র থাইল্যাণ্ড।

ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদেব বর্ণাঢ্য পরিবেশ থাইল্যাণ্ডেব রাজধানী ব্যাংককে করে রেখেছে উজ্জ্বল। কী এক প্রশান্তি ব্যাংককে ঘিরে সদা প্রবাহিত। ধীর স্থিব শান্ত সৌম্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দল তথাগতের আরাধণায় সদা ব্যস্ত। অহিংসাব মূলমন্ত্র জীবনের সার করে বৌদ্ধ নরনারী তাদের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে নিরাসক্ত। তারা আপন পরিধীর মাঝে নিজেদের সীমাবদ্ধ বাখে। অনাবশ্যক কৌতুহলকে এড়িয়ে চলে। তারা বেঁচে থাকে আপন ভাবে।

ব্যাংককের সেই শান্ত পরিবেশে নিজেকে তাঁর হারিয়ে ফেলার ভয় জাগল মনে। সরে গেলেন দূরে। রাজধানী থেকে গ্রামে। শহরের সভ্যতা থেকে দূরের নির্জনে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।

সাড়া জাগাতে সমর্থ হলেন গ্রামের মানুষের মনে। কৌতুহলী মানুষের দল দূরে এসে দাঁড়াল। তাঁকে দেখল। চীনা নন আন্নামী, তাদেব দেশের লোক, ঘরের মানুষ। জানতে চাইল পরিচয়, উদ্দেশ্য

তিনি থান আই। বন্ধু। মানুষের বন্ধু তিনি।

গ্রামের মানুষ, থাইল্যাণ্ডবাসী ভিয়েৎনামীরা দিনের পর দিন ভিড় করতে লাগল তাঁর কাছে। তিনিও নিরাশ করলেন না তাদের। গড়লেন স্কুল। ভিয়েৎনামী ছেলেদেব সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের ছেলেদেরও শিক্ষা দিতে লাগলেন।

বার করলেন কাগজ। সে কাগজেরও নাম 'থান আই'। সেই কাগজে লেখা হতে লাগল ভিয়েৎনামের ইতিহাস। অতীতের দিন-গুলিকেও তুলে ধরতে লাগলেন। ভিয়েৎনামের শৌর্য্য-বীর্য্যের

দিনগুলিকে। যেদিন ভিয়েৎনাম স্বাধীন ছিল। বিদেশী হানাদারদের আক্রমণকে বাধা দিতে প্রাণ দিয়েছিল ভিয়েৎনামের মানুষ। জীবন দিয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতা তুলে দেয়নি।

অতীতের ভিয়েৎনাম যা পেরেছিল আজ পারে না কেন? আজ কেন সে অসহায় ভাবে দিনের পর দিন বিদেশী শাসকের পায়ের তলায় পড়ে মার খাচ্ছে, আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করছে, তবু প্রতিবাদ জানাচ্ছে না! কেন?

কেন-র প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারেনি। তিনিও পীড়াপিড়ি করেননি সে উত্তরের জন্যে। শুধু দিনের পর দিন মানুষের চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল হতে বলেছেন। দেশ যদি আজ শত্রুমুক্ত হয় তাহলে কেন তোমরা এখানে পড়ে থাকবে? কেন আপন অধিকারে ফিরে যাবে না দেশের মাটিতে।

দেশের স্বাধীনতা তারা চায়। চায় দেশের মাটিতে ফিরে যেতে কিন্তু ভুলতে পারে না রক্তাক্ত স্মৃতি। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও তারা দেশের মাটি আঁকড়ে পড়েছিল, যখন পারেনি তখনই বাধ্য হয়েছে দেশ ত্যাগ করতে।

তারা ভুলতে চায়। মুছে ফেলতে চায় রক্তের দাগ। তাদের বুকের পাঁজরে যে ক্ষতচিহ্ন।

তবু আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হল তারা। আর তারই জন্যে একদিন আবার তিনি ব্যাংককে ফিরে এলেন। সন্ন্যাসী হলেন। স্থান নিলেন প্যাগোডায়।

যারা তাঁর সঙ্গী হয়েছিল সঙ্গে এল তারা। সঙ্গীরা নিয়ে এল আরো নতুন ছেলে। প্যাগোডার অভ্যন্তরে বসে তাদের তিনি নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। গড়ে তুললেন গুপ্ত সমিতি। সমিতির সদস্যদের নির্দেশ দিলেন থাইল্যাণ্ডের ভিয়েতনামীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার, বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করার, তাদের সেবা করে বন্ধু হওয়ার।

তাঁর এই নির্দেশ হয়তো অনেকেরই পছন্দ হয়নি সেদিন। তবু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে প্রতিবাদ জানানোর সাহস হয়নি কারো। ক্যাণ্টন থেকে যাদের তিনি ভিয়েৎনামে পাঠিয়েছিলেন তাদের প্রতি আবার নতুন নির্দেশ পাঠালেন।

তারা অধৈর্য্য প্রশ্ন করলো, আর কতদিন? আর কতদিন এমনি ভাবে নিরস্ত্রীয় হয়ে থাকতে হবে আমাদের?

বললেন, যতদিন না আমাদের প্রতি ভিয়েৎনামের মানুষের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন এই ভাবে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

অসম্ভব! মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে বলল তারা। আর তার ফলস্বরূপ ১৯২৯ সালের ১৮ই জুন টং কিনের প্রতিনিধিরা থান নিয়েন পার্টি ভেঙ্গে দিয়ে ইন্দোচায়না কম্যুনিষ্ট লীগ তৈরি করল। নতুন নামকরণ হল ড' ডুয়ং কং থান ডাং। টং কিন এবং উত্তর আন্নামের মধ্যে প্রস্তুতি শুরু করল। বিপ্লবের মন্ত্র নয় সশস্ত্র বিপ্লব করবে তারা। অস্ত্রের মুখে মোকাবিলা করবে বিদেশী শত্রুদের। দেশে আনবে স্বাধীনতা।

টং কিনের প্রতিনিধিদের দেখাদেখি কোচিন চীন দক্ষিণ আন্নামও নতুন পার্টি তৈরি করল। জন্ম হল দ্বিতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির, আন্নাম কং থান ডাং।

তৈরি হল তৃতীয় কমু্যনিষ্ট পার্টি। সকলেই চায় সশস্ত্র বিপ্লব। অস্ত্রের মুখে জবাব দিতে হবে শত্রুর বর্বরতার। বসে বসে বিপ্লবের বাণী প্রচার করা মানে শক্তির অপচয় করা। দেশের স্বাধীনতা কেড়ে আনতে গেলে এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

থান নিয়েনের নাম মুছে গেল। কজন সঙ্গী ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর। তিনি একা। তিনি রিক্ত নিঃস্ব। তাঁর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। শেষ হয়ে গেল আজীবনের স্বপ্ন সাধনা।

তবু তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। নীরবে নিভৃতে নিত্য দিনের কাজটুকু অবিচল ধৈর্য্যে শেষ করে যেতে লাগলেন। সঙ্গীরা যখন অন্যান্যদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করল তখন তিনি মৃদু হাসলেন।

মিথ্যা দুঃখ করে লাভ কী? যা থাকবে না তা শত চেষ্টাতেও ধরে রাখা সম্ভব নয়। তিনিও পারেন নি।

সঙ্গীদের কথার উত্তরে বললেন বটে কথাগুলো কিন্তু বুকখানা ভেঙ্গে গেছে তাঁর। ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। সেই ক্ষত থেকে শুরু হয়েছে রক্তধারা। যারা আজ ভুল বুঝে দূরে সরে গেল তাদের হারানোর বেদনা তিনি ভুলতে পারলেন না।

তবু তিনি নীরব রইলেন। নীরবে করে যেতে লাগলেন আপন কাজ।

কিন্তু নীরব থাকতে পারলেন না কোমিণ্টার্ণের নেতারা। মস্কো থেকে ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি ট্রান ফুকে ব্যাংককে পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা।

ব্যাংককে এলেন ট্রান ফু। দেখা করলেন সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে। বললেন, এ কী করছেন আপনি? এমন করলে সব যে শেষ হয়ে যাবে, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা যে কোনদিনই ফিরে আসবে না।

ট্রান ফু-র কথা শুনে তিনি কেবল মৃদু হাসলেন। উত্তর দিলেন না।

ট্রান ফু বললেন, আপনি কিছু করুন।

কী করবো? জানতে চাইলেন তিনিও।

দলে দলে এ বিবাদ মিটিয়ে দিন।

তা কী সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়?

আপনি তাহলে চেষ্টা করে দেখুন।

আমি? অসহায় বোধ করলেন ট্রান ফু। স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলেন, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিবাদ একমাত্র আপনিই মেটাতে পাবেন।

আমি! অসহায়তার প্রকাশ নয়, হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমিও হয়তো পারি না।

আপনিও পারেন না? চমকে উঠলেন ট্রান ফু। এ কি বলছেন তিনি। এ কি অবিশ্বাস্য কথা ওঁর মুখে? এ যে অসহায়তার প্রকাশ। ে কদিন যিনি সাবা দেশে, দেশেব বাইরেও বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন; মানুষেব বুকে জ্বালিয়েছেন আগুন, তাঁব মুখে একি কথা শুনছেন তিনি!

তিনি কী শেষ হয়ে গেছেন? ফুবিয়ে গেছে কর্মক্ষমতা? তা যদি না হবে এমন কথা তি'নি বলবেন কেন? না ধর্মেব পোষাক পরে তিনি সব বিস্মৃত হয়েছেন। নিভে গেছে আগুন। অবশিষ্ট আছে ভস্মরাশি।

ট্রান ফু-র মনটা সংসায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করতে মন চায়নি তাঁর। তিনি নিরুপায়ভাবে নীববে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, সত্যিই হয়তো আমাব পক্ষে মিলন ঘটানো সম্ভব নয়।

তাহলে উপায়?

আমি জানিনা। কাবণ আমাব নির্দেশকে তাবা ভুল বুঝে দূবে সরে গেছে। এখন আমাব উচিৎ হবে না তাদেব কিছু বলা। তবে আমাব দৃঢ় বিশ্বাস ভুল সংশোধনেব সুযোগ এলে নিশ্চই তাবা আবার একসঙ্গে মিলিত হবে।

ট্রান ফু মস্কো ফিবে গেলেন। নগুয়েন ব্যাংকক ছেড়ে হংকংয়েব পথে যাত্রা সুরু কবলেন।

১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে হংকংয়ে গেলেন তিনি। তিন

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সে ডাককে উপেক্ষা কবার সাহস কারো হল না। একে একে সকলেই এসে হাজির হলেন। যেন অপরাধীর শাস্তি গ্রহণে উপস্থিত হল তারা।

কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিব ভাগাভাগি নিয়ে একটি কথাও তিনি তুললেন না। নতুন কর্মসূচী শুধু তাদেব হাতে তুলে দিলেন। শান্ত ধীরকণ্ঠে জানতে চাইলেন, এই কর্মসূচী কী তোমরা গ্রহণ কবতে পার না?

অস্বীকার! অসম্ভব। কাবো সাধ্য হলনা সেটুকু। হাতে হাত মেলালো তাবা। ভাঙাপার্টি জোড়া লাগলো আবার। মিটে গেল বিরোধ। ইন্দোচায়না কম্যুনিষ্ট লীগে আবার মিলে গেল দুটি পার্টি।

১৯৩০ সালে সকলে মিলে একসঙ্গে তৈবি করলেন ইন্দোচায়না কম্যুনিষ্ট পার্টি।

অপরিবর্তিত বইলো আগেকাব কার্যসূচী।

বিপ্লব সফল হয় মিলিত শক্তিতে। প্রয়োজন জাগবণেব।

কিন্তু সে জাগরণেব পূর্বেই বিস্ফোবণ ঘটলো।

১০ই ফেব্রুয়াবী ১৯৩০ সাল।

ভিয়েৎনামের ইতিহাসে একটি রক্তাক্ত অধ্যায়েব সূচনা হল।

আর নয় এবাব বন্ধন মুক্তিব লগ্ন এসেছে। ভিয়েৎনামের মাটি থেকে দূর কবতে হবে ফবাসীদেব। ভিয়েৎনামেব জাতীয়বাদী পার্টি ভিয়েৎনাম কুয়োক দান দাং স্থিব করল তার কার্যসূচী। গোপনে ডাক দিল মানুষকে। বলল, তোমবা এগিয়ে এসো। জাতীয় অভ্যুত্থানের অংশ নাও। আমরা তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেব।

ইয়েন বের সামরিক ঘাঁটির ভিয়েৎনামী সৈন্যরা যোগ দিল দলে। জানানো হল ১০ ফেব্রুয়ারী শুরু হবে বন্ধন-মুক্তির অভিযান।

কিন্তু পরে ১০ই এর স্থলে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পেছিয়ে গেল দিন। পত্রবাহক গোপন পত্র নিয়ে পৌঁছে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু তার ধরা পড়ার সংবাদকে গোপন রাখা হল।

১০ই ফেব্রুয়ারী ভোর হল। শীতের কুয়াশার মাঝে আলো ফুটলো আস্তে আস্তে। রেড রিভারের তীরের ইয়েন বের সামরিক ঘাঁটির ভিয়েৎনামী সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। অস্ত্র নিয়ে প্রথম আক্রমণ করলো সামরিক অফিসটিকে। সব কিছু তছনছ করে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। হত্যা করলো কজন ফরাসী ক্যাপ্টেনকে।

কিন্তু তারপর ?

হঠাৎ বুম বুম শব্দে চকিত হল তারা। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল অসংখ্য ফরাসী বোমারু বিমান।

প্লেন কেন ? প্লেন ...

চিৎকার করে উঠলো তারা। জানতে চাইলো। কিন্তু তাদের সে চিৎকার নিজেরা ভিন্ন আর কেউ শুনলো না। কেউ জবাব দিল না তাদের জিজ্ঞাসার।

হঠাৎ ওপরে উড়তে উড়তে একত্র হয়ে নেমে এল প্লেনগুলি। ছড়িয়ে দিল বোমা। উড়িয়ে দিল ইয়েন বের সামরিক ঘাঁটি। মৃত সৈন্যদের পাহাড় জমে গেল। অসংখ্য ভিয়েৎনামী সৈন্যদের একজনও বাঁচতে পারল না।

সামান্য ভুলের জন্য অঘটন ঘটে গেল। সে ভুল জাতীয়বাদী নেতা ন্যুয়েন আই হকের। তার দিন পরিবর্তনের ফলেই ঘটে গেল চরম সর্বনাশ। যদি তিনি দিন পরিবর্তন না করতেন তাহলে হয়তো নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হত ভিয়েৎনামের মাটিতে।

কিন্তু সব কিছু বরবাদ হয়ে গেল সামান্য ভুলের জন্য।

বিদ্রোহীদের সন্ধানে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটে বেড়াতে লাগলো ফরাসী সৈন্যের দল। যাকে সন্দেহ হল ঘর থেকে টেনে বার করে

জিজ্ঞাসাবাদ করলো। চলল জিজ্ঞাসাবাদ। সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে চালালো নির্যাতন।

সন্ধান চায় ফরাসী সৈন্যরা। সন্ধান তারা পেলও। অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে মানুষ বলে দিল তাদের ঠিকানা। গ্রাম কো আম। সেখানেই তারা আশ্রয় নিয়েছে।

কো আম গ্রামে আশ্রয় নেওয়া বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরাসী সৈন্যরা। বিদ্রোহীরাও চুপ করে থাকল না। শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ। শুধু স্থলবাহিনী নয়, কয়েক শো বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করতে এলো বিমানবাহিনী। চলল বোমা বর্ষণ।. বিদ্রোহীদের সঙ্গে একসময় কো আম গ্রামখানিও মিশে গেল মাটির সঙ্গে।

বন্দী বিদ্রোহীদের নিয়ে বিজয়ী ফরাসী সৈন্যরা সদর্পে ফিরে গেল ইয়েন বে'তে। সেখানেই বসলো বিচার সভা। নুয়েন আই হক আর তাঁর সহকর্মীদের বিচার হল সামরিক আদালতে। বিচারে প্রাণ দণ্ড হল তাঁদের। ফরাসী রাইফেলের গুলি বিদ্ধ করল তাদের হৃদপিণ্ড।

জাতীয়তাবাদীরা শেষ হল, এবার কম্যুনিষ্টদের পালা। ফরাসী সরকার কম্যুনিষ্টদের ওপর দৃষ্টি দিল এবার।

কিন্তু সে সময় কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা ছিল নিতান্ত সাধারণ। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের কাজে সাহায্য করছে, চাষীদের ফসল বুনে দিচ্ছে, পাখির অত্যাচারে যাতে ফসল নষ্ট না হয়ে যায় দেখছে, পাঠশালা খুলছে, ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছে। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে তারা। তারা যে কম্যুনিষ্ট এর কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। হোক না তাদের অনেক দূরে বাড়ি। ভিয়েৎনামের কোন এক প্রান্তে আপন ঘর কিন্তু গ্রামের মানুষের সঙ্গে তারা সহজ সমান।

গ্রামের মানুষ প্রথম প্রথম তাদের সন্দেহ করেছিল। প্রাণ খুলে মিশতে যেন ভয় পেয়েছিল কিন্তু ধীরে ধীরে মিশেছিল তাদের সঙ্গে,

দেখেছিল তাদের মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। কম্যুনিষ্ট হলেও তারা অতি সাধারণ মানুষ। তাদেরই মত একজন। তাদের আপনজন।

আপনজনদের কথা শুনেছে তারা। শুনে দেখেছে ফল কিছু মন্দ হয়নি বরং ভালই হয়েছে। ফসলের ফলন বেড়েছে। দারিদ্রের চাপ আর শাসকের দলের উদাসীনতায় যে অশিক্ষা তা দূর হয়েছে। লাঘব হয়েছে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের। কাজের দায়িত্ব কম্যুনিষ্টদের দল স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাদের চিন্তা করার সুযোগ এনে দিয়েছে একটা সহজ গতির মধ্যে এনেছে জীবনকে।

গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাদের বন্ধু হয়ে যারা মিলেমিশে গেছে, উন্নত করতে চাইছে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান, সেই কম্যুনিষ্ট-দের ওপর এবার নজর দিল ফরাসী সরকার।

কারণ ওরা এতদিনে যেন কম্যুনিষ্টদের স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল। জাতীয়তাবাদী দল নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। তরুণ রক্তের মাঝে তারা তাদের বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এরা যে গ্রামের সমাজ, প্রতিটি মানুষকে নিজেদের করে নিয়েছে। মন থেকে দূর করছে অজ্ঞানতার অন্ধকার। বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার পথে এগিয়ে চলেছে ধীরে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে।

এদের মনে যখন জাগরণের ঢেউ বহে যাবে তখন বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সবকিছু ভেঙ্গে গুড়িয়ে চুরমার করে দিয়ে কূলে কূলে প্লাবিত হবে। সেই কল্লোল রোধ করার ক্ষমতা কোন বিরুদ্ধশক্তির হবে না। কোন বাধা মানবে না। মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবে স্থির লক্ষ্যের দিকে।

জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহকে ব্যর্থ করার পর সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারল ফরাসী কর্তৃপক্ষ। এতদিন তারা ভিয়েৎনামের দুটি দলকে একভাবেই দেখেছিল। কিন্তু যখন দেখল জাতীয়তা-বাদীদের বিদ্রোহ, ঙুয়েন আই হক ও তার সহকর্মীদের মৃত্যু,

কো আম গ্রামখানাকে বোমাব আঘাতে নিশ্চিহ্ন কবে দেওয়ায় কম্যুনিষ্টবা সম্পূর্ণ নীবব উদাসীন, প্রতিবাদ কবা দূবে থাক এতটুকু কৌতুহল প্রকাশও কবল না, তখন ভবিষ্যতেব কথা চিন্তা করে খুনেব নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠলো তাবা। খুঁজতে লাগলো সুযোগ, কী কবে কম্যুনিষ্টদেব শেষ কবা যায়।

এলো সেই সুযোগ। জাতীয়তাবাদীদের ব্যর্থ বিদ্রোহেব তিনটি মাস পবেই।

এলো ১৯৩০ সালেব মে দিবস।

সেই প্রথম কম্যুনিষ্ট পার্টিব নেতৃত্বে মিছিল কবলো চাষীবা। ভূখা মিছিল। ভিয়েৎনামেব হাজাব হাজাব লক্ষ লক্ষ চাষী তাদেব প্রতি বহুদিনেব বহু অন্যায় অত্যাচাবেব দৃপ্ত প্রতিবাদে ভিনেব কোর্টে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঘিবে ফেলেছিল সাম্রাজ্যবাদীদেব আস্তানাগুলিকে।

শহবে গ্রামে হাজাব হাজাব লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছিল সমিতিতে। গর্জে উঠেছিল তাদেব কণ্ঠ। কিন্তু ভিয়েৎনামেব স্বাধীনতাব দাবী সেদিন তাদেব কণ্ঠে ছিল না। তাদেব প্রতি অন্যায়েব প্রতিকাবেব দাবী জানিয়েছিল তাবা।

তাবা বলেছিল, আম মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে বোদে জলে পুড়ে ভিজে ফসল ফলাবো, অথচ ফসলে আমাদেব কোন অধিকাব থাকবে না, মাঠেব ফসল উঠবে না আমাদেব ঘবে, আমাদেব ঘবে ক্ষুধাব জ্বালায় শিশুবা চিৎকাব কবে কাঁদবে, এ অন্যায় আমবা সহ্য কববো না। আমাদেব জমি, আমবা পবিশ্রম কবি, ফসলেব অধিকার আমাদেব। অনধিকাবীদেব ফসলেব ভাগ আমবা দেব না। যে অন্যায় অবিচাব এতদিন আমাদেব ওপব হয়েছে, এখনও যদি সেই অন্যায় অত্যাচাব আমাদেব ওপব কেউ চালাতে আসে, আমবা মুখ বুজে পিঠ পেতে দিয়ে আঘাত গ্রহণ কববো না। আমরা আমাদের অধিকার বক্ষার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় দেব।

প্রাণ তারা দিল। ফরাসী সৈন্যের দল মেসিনগানের গুলিতে স্তব্ধ করতে চাইল প্রতিবাদের কণ্ঠ। পারল না। যারা প্রতীজ্ঞা করেছিল অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রাণ দেবে, তারা তাদের কথা রাখলো, প্রাণ দিল। ফবাসী সৈন্যদেব গুলিকে তাবা ভয় করলো না। এগিয়ে দিল বুক। শত শত মানুষ ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

আর মৃত্যুর পূর্বে চিৎকার করে বলল, ভয় পেও না। লড়াই-এ আমবা জিতেছি। এ লড়াইয়ে আমরা জিতবোই।

এর পরই পুরোদমে শুরু হল কম্যুনিষ্ট নিধন যজ্ঞ। চলল ব্যাপক-হারে গ্রেপ্তার। আবম্ভ হল বিচারেব নামে প্রহসন। যদিও সেটুকুর কোন প্রয়োজন ছিল না। ভবে গেল ভিয়েৎনামেব জেলখানাগুলো। নির্বাসনও জুটল কারো কারো ভাগ্যে।

যখন পুলো কোঁদাব দ্বীপ আর জেলখানাগুলো ভর্তি হয়ে গেল তখন চিন্তায় পড়লো ওরা। দিন দিন বন্দীব সংখ্যা বাড়ছে, অথচ বন্দীদের আটক কবে রাখাব স্থানের অভাব। নতুন যে বন্দীশালা গড়ে তোলা হবে তাবও সময় নেই। তাছাড়া বন্দীশালা তৈরি করতে অর্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন নিতান্ত বাজে কাজে ব্যয় করা হবে।

তবে কী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে কিংবা আর বন্দী করা হবে না? মাথা খারাপ তাই কখনো হয়? তাহলে যে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। দেশের মানুষগুলো ভাববে আমবা হেরে গেলুম।

ফরাসী প্রভুর দল চিন্তায় পড়লো। গোপনে বসলো আলোচনা-সভা। বন্দীদের রাখার স্থানাভাব সম্পর্কে আলোচনা চললো। নেওয়া হল সিদ্ধান্ত।

তারপর রাতের অন্ধকারে শুরু হল বন্দী-নিধন যজ্ঞ। গুলি নয়, বন্দীদের খাদ্যে মেশানো হল বিধ। সেই বিষ মেশানো খাদ্য খেতে

বাধ্য করানো হল বন্দীদেব। কাবা-যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি পেল তারা।

কখনো বা গুলি কবা হল। বন্দীশালার ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিয়ে চারিদিক থেকে চলল মেসিনগানেব গুলিবৃষ্টি। অসহায় মানুষগুলো বাঁচবাব জন্যে শুরু কবল ছুটোছুটি। আনন্দে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো ওরা।

অথচ যাদের ওরা ধবে এনে বন্দী কবেছিল তারা সবাই কম্যুনিষ্ট নয়, কম্যুনিষ্ট সংস্পর্শে আসেওনি।

তবে তাবা কাবা? কেনই বা তাদেব বন্দী কবা হয়েছিল?

কেন?

কেন-ব উত্তব যাবা বন্দী কবেছিল তাবা জানে না। যাবা বন্দী হয়েছিল তাবাও নয়। ফবাসী দমন নীতিব আইনে বুঝি কোন উত্তব ছিল না। ছিল ভয়, দম্ভ আব অত্যাচাবেয় নেশা।

সেই নেশায় মাতাল হয়ে ওবা ঝাঁপিযে পড়েছে নিবীহ শান্তি-প্রিয় গ্রামবাসীব ওপব। নিবিচাবে তাদেব সাজানো সংসাব ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে। বালক কিশোব বৃদ্ধ কেউ বেহাই পায়নি।

স্কুল থেকে ছুটিব পব বাড়ী ফিবছে ছেলেব দল। হঠাৎ ফবাসী সৈন্যদল তাদেব গতি বোধ কবলো। ট্রাক থেকে নেমে বাইফেল উঁচিযে ঘিবে ধবলো ওদেব।

অবাক হল ওবা। বুঝতে পাবল না সৈন্যদেব এমন ব্যবহাবেব কাবণ। ভেবে পেল না কী অপবাধ তাবা কবেছে!

তাদেব কাছে জানতে চাওয়া হল তাবা কম্যুনিষ্ট কীনা?

কম্যুনিষ্ট!

ততোধিক অবাক হল তাবা। তাবা কম্যুনিষ্ট! কম্যুনিষ্ট নামে যা শুনেছে তা তাহলে অন্য কিছু নয়, মানুষ। কিন্তু আগে এ ধারনাটুকু তাদেব হয়নি। শত অত্যাচাব অন্যায়েব মাঝে বাস কবেও

তাদের পড়াশুনা চালিয়ে গেছে। স্কুল আর বাড়ী। তার বাইরের কিছু তাদেব মনে কৌতুহল জাগালেও আকর্ষণ করেনি।

সেই তাবা ফবাসী সৈন্যদেব কাছে কম্যুনিষ্ট হয়ে গেল। আনন্দের সঙ্গে আশঙ্কা জাগলো, ভয়। তারা বলল, আমরা কিছু জানি না।

মিথ্যে কথা। গর্জে উঠলো ফবাসী সৈন্যের কণ্ঠ।

আমরা সত্যি বলছি। বুদ্ধেব নামে শপথ কবছি। তাদেব ভয় পাওয়া কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়লো।

সত্যি বলছি। বুদ্ধেব নামে শপথ কবছি! শয়তানের দল ক্ষেপে উঠল যেন। হাতেব বাইফেল মাথায় পড়লো একজনেব। মাথা ভেঙ্গে চৌচিব। পথেব ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো বালকেব দেহ।

ভীড় হয়ে গেল। গ্রামেব মানুষ নীবব প্রতিবাদে দূবে এসে দাঁড়াল। প্রতিবাদ কবতে পারল না অত্যাচাবেব।

আর জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। ছেলেগুলোব গলায় দড়ি বাঁধলো ওবা। যেন পশুব গলায় দড়িব মালা পরিয়ে দিল, নিয়ে যাওয়াব সুবিধা হবে।

তাবপব যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল গ্রামেব পথে ধূলোব ঝড় তুলে।

ওধাবে হয়তো প্রতীক্ষা কবছে ম। ছেলে সেই সকালে ছুটি খেয়ে স্কুলে গেছে, ফিবে এসেই বই খাতা বাখাব সময় পাবে না। ছুটি খেতে দিতে হবে তাকে। তাই শত কাজ থাকলেও ক্ষুধার্ত ছেলেকে ছুটি খেতে দেওয়াব জন্যে অপেক্ষা কবতে হবে তাকে।

ছেলে এল না। ব্যাকুল জননী একবাব ঘব একবাব বাইবে গিয়ে দাঁড়ায়। পথচাবীদেব জিজ্ঞাসা কবে তাবা তাব ছেলেকে দেখেছে কী না?

পথচাবীব 'জানিনা' উত্তবে ব্যাকুলতা বাড়ে।

তাবপব মনে পড়ে একটি কথা। পাড়াব আবো কজন ছেলেও

তো তার ছেলের সঙ্গে স্কুলে যায়। তারা ফিরেছে কী? না শুধু তারই ছেলে ফেরে নি?

একবার মনে হয়, যায়, গিয়ে জেনে আসে। কিন্তু যেতে পারে না। যদি এখুনি ফিরে আসে ছেলে।

পুত্রের জন্যে একাকিনী মায়ের শুরু হয় নীরব প্রতীক্ষার কাল।

অবশেষে প্রতীক্ষারতা জননীর প্রতীক্ষার প্রহর গোনা শেষ হয়। আসে সংবাদ। পুত্রের সংবাদ। দুঃসংবাদ নিয়ে আসে একজন।

ছেলেকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। কারণ ছেলে তার কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে।

কম্যুনিষ্ট! চমকে ওঠে জননী। তার দুধের শিশু কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি নয়। মিথ্যা-মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যাকেই ওরা সত্য প্রমাণিত করেছে। ওদের গুলিভরা রাইফেল ভিয়েৎনামী বালককে কম্যুনিষ্ট করছে।

চমৎকার। কী অপূর্ব সাদা চামড়ার জহ্লাদের অত্যাচারের নমুনা। পেটে মেরেছে। কেড়ে নিয়েছে মানুষের মত বাঁচার অধিকার। তবু নিষ্কৃতি মেলেনি। ওরা ভিয়েৎনামের মানুষকে বাচতে দেবে না। ওরা শেষ করে দিতে চায় ভিয়েৎনামীদের।

মায়ের চোখে জল। ভিয়েৎনামী মা। সন্তানের জন্যে নয়, এ জল তার চোখে, কোন প্রতিকার হচ্ছে না বলে, কেন ভিয়েৎনামের মানুষ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে না?

সন্ধ্যা নেমেছে। পাখিরা ফিরে গেছে আপন কুলায়। মাঠ থেকে সারাদিনের কাজের শেষে ফিরে গেছে চাষীর দল। ওরা তখনও ফিরতে পারেনি কজন। তখনও সামান্য কাজ বাকী ওদের।

হঠাৎ মিলিটারী ট্রাক থামার শব্দ, তীব্র আলো এসে পড়লো কর্মরত কজন মানুষের ওপর। হাতের কাজ ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল ওরা।

এগিয়ে এল সৈন্যরা। প্রশ্ন হল, কী করছো তোমরা এখানে?

কোন যুবক চাষী কৌতুক কণ্ঠে জবাব দিল, মাঠে কী করে স্যার?

গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ হল, যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও।

কাজ করছি আমরা। জবাব দিল কেউ।

কাজ করছো? রাত্রি বেলা কেউ কাজ করে?

আমাদের কিছু কাজ এখনো রয়েছে, শেষ করতে না পারার জন্যে ফিরতে পারিনি।

দেখি কী কাজ করছো? এগিয়ে গেল ওরা। ধানের চারা পুঁতছিল চাষীরা। সারা মাঠ কাদায় কাদা। সেই কাদা ভেঙ্গে জমিটুকু চষে ফেলল ওরা। সদ্য পোঁতা ধানের চারাগুলি ওদের পায়ের তলায় পিষ্ট হল। নষ্ট হল সারা দিনের পরিশ্রম, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

দেখার পালা শেষ করে আবার ওরা ফিরে এল। বলল, সত্যি বল তোমরা রাত্রে কি করছো?

আমরা ধানের চারা পুঁতছি।

মিথ্যে কথা।

সত্যি বলছি।

বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস! বিশ্বাসের স্থান নেই ওদের মনে। বিশ্বাস যে কী বস্তু ওরা যে তা জানে না। ওদের জীবনে বিশ্বাসের কোন বালাই নেই। বলল, তোমাদের যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

কোথায় যেতে হবে সে প্রশ্ন ওরা করলো না। বলল, আমাদের কাজ যে এখনও শেষ হয়নি।

তোমাদের কাজ যাতে শেষ না হয় সেই ব্যবস্থাই আমরা করবো। চল।

অনুরোধ নয় আদেশ। যেতে হবে ওদের সঙ্গে। গেলে যে

ফিরতে পারবে তার কোন স্থিরতা নেই। যারা যায়, যাদের ওঁরা নিয়ে যায় তারা আর ফেরে না। যে গেছে সে আর ফিরে আসেনি।

সেই কৌতুকপ্রিয় যুবকের কণ্ঠ শোনা যায়, স্যার নিয়েতো যাচ্ছেন কিন্তু যে কাজগুলো পড়ে রইলো সেগুলো কে শেষ করবে? আমরা এসে আবার শেষ করতে পারবো তো?

তুমি কী যাবে না?

যাবো না এ কথা বলছি না, বলা উচিতও নয়, শুধু জিজ্ঞাসা করছি আমাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে কারা? কারণ ফসল যদি না হয় তাহলে লোকসানটা আমাদের থেকে আপনাদেরই বেশি। হয়তো ··

কৌতুকপ্রিয় যুবকটি আর কিছু বলতে পারেনি। বলতে দেওয়া হয়নি তাকে। পিছন থেকে কে যেন আঘাত করেছিল তার মাথায়। মাঠের কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সে। অন্ধকারে ওদের হাতের টর্চের আলোয় তার রক্তের রঙ্ দেখা গিয়েছিল, লাল টক্‌টকে।

কম্যুনিষ্ট নিধন যজ্ঞে অস্থীর হয়ে উঠল মানুষ। অস্থির হয়ে উঠলেন কম্যুনিষ্ট নেতারাও। তাকালেন তাঁর দিকে। জানতে চাইলেন কী করবো?

না এখনও সময় আসেনি। প্রস্তুত হয়নি বিপ্লবের ক্ষেত্র.

করে হবে? আর কতদিন? কতদিন মানুষ এ অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবে? আর কতদিন?

অত্যাচার? না এতো অত্যাচার নয়—একে অত্যাচার বলে না। অত্যাচারের সীমা তো এখনও লংঘন করেনি। বুকের রক্তে মানুষ এখনও অনুভব করেনি মৃত্যু স্পন্দন। মানুষ তো এখনও ঘুমিয়ে আছে। এখনও তো তারা বিদেশী শাসকশ্রেণীর এই অত্যাচারকে

কপালের লিখন বলে ভাবতে পারছে। ভাবছে এ তাদের পূর্বজন্মের কর্মফল।

যেদিন তা পারবে না সেদিনই শুরু হবে প্রকৃত জাগরণ। সেদিন মানুষ তার সবকিছু ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে রক্তসমুদ্রে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে তাদের সম্মিলিত কণ্ঠ। তারা একসঙ্গে এগিয়ে যাবে। তাকাবে না পিছু ফিরে। হিসাব করবে না আপন জীবনের। করবে না বিচার। ভুলে যাবে সে কি ছিল। বর্তমানটাই সত্য বলে সে আঁকড়ে ধরবে। এগিয়ে যাবে আগামী দিনের পথে।

কিন্তু এখন নয়। এখনও সে সময় আসেনি। এখনও সে তার শক্তির প্রতি আস্থা ফিরে পায়নি। এখনও তার মনে সন্দেহ আছে, ভয়, মনের জড়তাটুকু সর্বাগ্রে দূর হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবের পথকে মনেপ্রাণে দেহের সমস্ত শক্তিতে আঁকড়ে ধরতে হবে। আঘাত হানতে শক্তির প্রয়োজন। চাই ইস্পাতের চেয়েও কঠিন মন।

বিদেশী শাসকের অত্যাচার যত চরমে উঠবে ততোই কঠিন হবে মন। স্থির হবে লক্ষ্য। তখন শুধুমাত্র ডাক দিলেই তারা এগিয়ে আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে; ডেকে ডেকে তাদের হাত ধরে বার করে আনতে হবে না।

সেদিন আসছে। সেদিন আসবে।

ভিয়েৎনামের সে জাগরণ মিথ্যা হবে না।

ভিনের আদালতে বিচারকদের রায়ে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। অথচ অপরাধীর কাঠগড়া শূন্যই রইলো।

তা থাক। নাইবা রইলেন তিনি। তাঁর নামে উচ্চারিত হল মৃত্যুদণ্ড। ফরাসী বিচারক অনেক চিন্তা করে, ক'রাত্রি জাগরণের পর আইনের নথিপত্র উল্টে সগর্বে কিছু বক্তৃতা শেষে রায় দিল, নগুয়েন আই কুয়োক একজন জঘন্য অপরাধী, সমস্ত ভিয়েৎনামে কম্যুনিজমের হাওয়া এনে দিয়েছেন তিনি। দেশের প্রতিটি মানুষকে কম্যুনিষ্ট করেছেন, অতএব তাঁকে শাস্তি না দিলেই নয়। এত-অত-শত অমুক ধারায়, সুসভ্য ফরাসী আইনে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

যাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল তিনি ফরাসী শাসনের আওতার বাইরে। সমগ্র ফ্রান্সের সাধ্য কী তাঁর গায়ে হাত দেয়। তবু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল তাঁকে।

তিনি তখন হংকংয়ে। হংকংয়ে বসেই জানতে পারলেন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ। শুনে হয়তো আনন্দ পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু ভয় পাননি। কারণ ভয় পাওয়াকেই তিনি ভয় করেন চেয়ে বেশি।

ফরাসীরা বৃটিশ শাসকদের অনুরোধ জানালেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে তাঁরা যেন দয়া করে তাদের হাতে তুলে দেন, নাহলে ফরাসী আইনের মুখে কালি পড়বে।

ফরাসী আইনের মুখে কালিমা লেপনের চেয়েও কম্যুনিষ্ট ভীতি বৃটিশ সরকারের বড় কম নয়। ভিয়েৎনামে যদি সত্যি সত্যিই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেই হাওয়া শিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে

পড়বে। হয়তো ভিয়েৎনামের পথ ধরবে হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়, ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মানবেন্দ্র রায় তো মস্কোতে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে দিয়েছেন। ঘুরে গেছেন জহরলাল নেহেরুও। গান্ধী যদি কংগ্রেস ছেড়ে কম্যুনিষ্ট হন, যদি তিনি বিপ্লবের পথে লাভ করতে চান স্বাধীনতা, তাহলে সাধ্য কী ভারতবর্ষের বিপুল শক্তিকে বাধা দেওয়া। তাদের বেনীয়া বেসাতী একদিনেই শেষ হয়ে যাবে।

বৃটিশ সরকার ফরাসী সরকারের অনুরোধ গ্রহণ করল। শুরু হল বৃটিশ গোয়েন্দাদের খোঁজার পালা। খুঁজতে খুব বেশি হল না তাদের। ১৯৩১ সালের ৬ই জুন বৃটিশ গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিনি আর ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন নেতা জোসেফ ডুক্রোক্স।

হংকং তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির তীর্থক্ষেত্র। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা সেখানে বাস করেন। নগুয়েন আই কুয়োক এবং জোসেফ ডুক্রোক্সের গ্রেপ্তারে প্রমাদ গুনলেন তাঁরা। ওঁদের মুক্তির জন্য বৃটিশ শ্রমিকদের অনুরোধ জানালেন তাঁরা।

বৃটিশ সরকার নির্দেশ দিয়েছিল গ্রেপ্তারের পর তাঁকে যেন ফরাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু বৃটিশ শ্রমিকদের চাপে আর স্যার ষ্ট্রাফোর্ডক্রীপসের চেষ্টায় সম্ভব হল না তা। পরিবর্তে হংকংয়ের বৃটিশ আদালতের বিচারে নগুয়েন আই কুয়োকের আঠারো মাস আর জোসেফ ডুক্রোক্সের ছ মাসের কারাদণ্ড হল।

যাঁদের দুজনকে বৃটিশ আদালত কারাদণ্ড দিল তাদের একজন তখন রাজ রোগে ভুগছেন। তিনি নগুয়েন আই কুয়োক। রোগ যে তাঁর হয়েছে অনেকদিন আগেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু গোপন করে রেখেছিলেন তা। জানতে দেননি সহকর্মীদের। জানতে দিলেও হয়তো লাভ কিছু হোত না। কারণ দুর্লভ অসুখটুকুর চিকিৎসা ব্যায়সাধ্য। প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। সে অর্থ

তাদের ছিলনা। যেটুকু ছিল সেটুকু নিজের অসুখে খরচ করতে তিনি চান নি।

তিনি চেয়েছেন কাজ করতে। করে গেছেন কাজ। রোগ যন্ত্রণা বুঝতে দেননি। কাশির দমকে যখন রক্ত উঠেছে সে রক্তটুকু সহকর্মীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মুছে ফেলেছেন।

কাজ, কাজ আর কাজ।

সময় অল্প। জমে আছে কাজের পাহাড়। সেই কাজ শেষ করতে হবে। বিশ্রামের অবকাশ নেই, থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে, পৌঁছাতে হবে লক্ষ্যে—পথের শেষ এখনও অনেক দূর। সেই দূরত্ব অতিক্রম করতেই হবে। ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা, মানুষের বন্ধন মুক্তি তবেই ঘটবে।

আমি থাকবো না। মানুষ চিরস্থায়ী নয়। সফল করতে হবে জীবনের ব্রত। আমাদের দেশ, মানুষের মুক্তিই আমার একমাত্র কাম্য। আমি আমার বুকের শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিঃশেষ করতে চাই। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমি সব পারি। সব।

অন্ধকার কারাকক্ষ। নিঃসঙ্গ বন্দী। একাকী বসে ভাবেন। দিনের পর দিন। দিন রাত্রি। ক্লান্তি নেই। জানলা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। বুঝি দেখতে চান ভিয়েৎনামের আকাশ। ভিয়েৎনামের আকাশের মুক্ত সূর্যকে।

ভাবেন সঙ্গীদের কথা। কী করছে তারা এখন? তারা তাদের কাজ করছে তো? তিনি নেই বলে তারা তাদের কাজ বন্ধ করেনি তো?

তারা যেন কাজ বন্ধ না করে। নাইবা তিনি রইলেন। তিনি তো চিরদিন থাকবেন না। হয়তো অসমাপ্ত কাজটুকু শেষ করার আগেই তাঁকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে দুঃখ নেই তাঁর। শুধু জেনে যেতে চান কাজ করছে

[illegible]। থামেনি, চায়নি পেছন ফিরে, এগিয়ে চলেছে লক্ষ্য পথে। আর কিছু নয় আর কিছু চান না। শুধু কাজটুকু যেন সুসম্পন্ন হয়। সার্থক হয় যেন ভিয়েৎনামের স্বপ্ন।

বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে কেশে চলেন তিনি। রক্ত ওঠে ঝলকে ঝলকে। লাল টকটকে।

কারা-অধিকর্তার কাছে সংবাদ যায়। ডাক্তার পাঠিয়ে দেন তিনি বন্দীকে পরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারকে ফিরে যেতে হয়। বন্দী রাজী নন নিজেকে পরীক্ষা করতে দিতে।

তখন তিনি নিজেই ছুটে আসেন। প্রশ্ন করেন, আপনি ডাক্তারকে ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন?

কোন প্রয়োজন নেই বলে।

আপনি অসুস্থ।

আমি জানি সে কথা।

জানেন অথচ পরীক্ষা করতে দেননি? বিস্মিত হন তিনি।

তাই। কারণ ডাক্তার পরীক্ষা করে যা জানতে পারবেন আমি নিজেও যে তা জানি।

আপনি জানেন আপনার কী অসুখ হয়েছে?

জানি। টি বি হয়েছে আমার। একদিকের বুকের পাঁজর ক্ষত হয়ে গেছে।

সর্বনাশ। আঁতকে উঠেছিলেন তিনি। বন্দী বলে কি! বুকের পাঁজর ক্ষয়ে গেছে তবু কোন রকম দুর্ভাবনার চিহ্নমাত্র নেই মুখের কোথাও। একি সম্ভব? দীর্ঘ দিনের কারাজীবনের এমন তিনি দেখেন নি। বরং দেখেছেন অসুখ না হলেও বন্দীর দল হাসপাতালে চলে যায় বিশ্রামের আশায়।

পর মুহূর্তেই একটা কথা মনে পড়েছিল তাঁর। বন্দীর পরিচয়। একজন কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্টরা বোধহয় এমনই হয়।

বলেছিলেন, আপনার বুকের পাঁজর ক্ষয়ে গেছে তবু আপনি ডাক্তারকে পরীক্ষা করতে দিলেন না। আপনি কী আপনার অসুখের চিকিৎসা করতে দিতে চান না?

লাভ কী? হাসি মুখে বলেছিলেন তিনি।

এই রোগ শরীরে পুষে বেঁচে থাকবেন?

এ রোগ সারিয়েও কোন লাভ হবে বলে তো আমার মনে হয়না। কারণ আমি জানি আমার শাস্তির মেয়াদ আঠারো মাস কিন্তু আঠারো মাস যে আঠারো বছর হবে না তারই স্থিরতা কী? যদি আঠারো বছর হয় তাহলে আমার শরীরের ক্ষয় রোগ একদিন না একদিন নিঃশেষ করে দেবে। মুছে যাব আমি। কিন্তু অসুখ সারিয়ে দীর্ঘ দিন বন্দী হয়ে থাকতে আমি চাই না।

তাহলে কী চান আপনি?

কাজ! আমার অসমাপ্ত কাজটুকু আমি শেষ করতে ইচ্ছা করি।

স্বেচ্ছায় তিনি হাসপাতালে গেলেন না। কারো অনুরোধেই কান দিলেন না। কিন্তু একদিন যেতে হল তাঁকে। অচেতন দেহটা কখন তাঁব অজান্তে পৌঁছে গেল এক শয্যায়।

আর হাসপাতাল থেকেই একদিন এক দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। সে সংবাদ নগুয়েন আই কুয়োকের মৃত্যু সংবাদ। যৎনামের ফরাসী শাসকের দলও সবকারী সূত্রে পেল সংবাদ। হংকংয়ের বৃটিশ জেল হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ভিয়েৎনামেব কম্যুনিষ্ট পার্টির পাণ্ডা নগুয়েন আই কুয়োকের। উল্লাসে আর একবার নেচে উঠল তারা।

তারপর?

মৃত্যু কী অত সোজা? যদি তাঁব মৃত্যু হোত তাহলে যে লেখা হোত না ভিয়েৎনামের নতুন ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরের পরিবর্তে অশ্রুজলের বন্যা বইতো। ভিয়েৎনাম মার

মানুষ আর কাঁদতো। মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারতো না। ভিয়েৎনামের মানুষ। পৃথিবীর দেশে দেশে ঘরে ঘরে, মানুষের কল্যাণে প্রসারিত যে হাত, সেই আমেরিকার রক্ত ক্ষুধার প্রকৃত স্বরূপকে কে তুলে ধরতো দুনিয়ার মানুষের চোখের সামনে? কে বলতে পারতো, আমেরিকা তুমি মানুষ নও, তোমার মানবতার বাণী মিথ্যা, শয়তানীর ফাঁদ। তুমি আজ করুণার অবতার সেজে পৃথিবীতে কায়েম করতে চাও জঘন্য নয়া সাম্রাজ্যবাদ। তুমি দেশে দেশে অস্ত্র-সম্ভারের সাহায্য পাঠিয়ে মানুষের মনুষত্ব বোধ, ভ্রাতৃপ্রেম শেষ করে দিচ্ছ। তুমি শান্তি নয় হিংসার মন্ত্র ছড়াচ্ছ। তুমি আজ পৃথিবীর যুব শক্তিকে বিপথে চালিত করতে চাও। কারণ তোমার দেশের যুবশক্তি আজ নিঃস্ব রিক্ত। প্রাচুর্যের যন্ত্রণায় দৈহিক ক্ষুধাকে তুমি দিয়েছ শ্রেষ্ঠত্ব।

বলেছে ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামের মানুষ তার সব শক্তি দিয়ে আঘাত হেনেছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বুকে। লিঙ্কনের আমেরিকার মৃত্যু ঘটেছে একথা সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষকে।

সাবধান করে বলেছে, ভুল কোর না। ভুল করে মৃত্যু ফাঁদে পা দিওনা তোমরা। ওদের বন্ধুত্বকে বিশ্বাস করো না। চিন্তা কর, বিচার কর। দেখবে আমার কথা মিথ্যা নয়। আমি মিথ্যা বলছি না।

মিথ্যা বলেনি ভিয়েৎনাম। মিথ্যাকে সে ঘৃণা করে।

অন্যায়কে সে মেনে নেয়নি। তার জীবন পণ। শয়তানের পদতলে মানবতাকে সে পিষ্ট হতে দেবে না।

আর তিনি?

হো চি মিন।

একটি মানুষ। তাঁর সাধনা। জীবনের রক্তাক্ত পথ পরিক্রমা।

জেলখানা তাঁকে ধরে রাখতে পারলনা। পালিয়ে গেলেন তিনি। কেমন করে পালালেন তা শুধু তিনিই জানেন। প্রকাশ করেন নি তিনি।

পৃথিবী থেকে নয়, জেলখানার হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এ্যামায়েতে গিয়ে অজ্ঞাত বাস শুরু করলেন তিনি। সেখানে বসেই দেখলেন, তাঁর মৃত্যু সংবাদে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। কমরেড নগুয়েন আই কুয়োককে বিদায় জানাচ্ছে বন্ধুর দল। বিদায় জানাল মস্কো।

দুঃখ? না দুঃখ হয়নি তার। বরং আনন্দ পেয়েছিলেন মনে মনে। যেন বেঁচে থেকেও কামনা করেছিলেন মৃত্যু। কারণ বেঁচে থাকলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। মৃতরূপেই তিনি কাজ করতে চান।

কিন্তু কাজ করার শক্তি যেন ফুরিয়ে আসতে লাগলো দিন দিন। সত্যিকারের মৃত্যুর ছায়া এসে লাগলো দু'চোখের পাতায়। আর তখনই বাঁচার জন্যে ব্যাকুলতা জাগলো তার অন্তরে। বাঁচতে চাইলেন তিনি।

এ্যামায়ের অজ্ঞাতবাস ত্যাগ করে সাংহাইয়েতে উপস্থিত হলেন তিনি। দেখা হয়ে গেল বন্ধু ভ্যালিয়েন্ট কুতুরিয়েরের সঙ্গে আর বন্ধু কুয়েতারের চেষ্টাতেই ১৯৩০ সালের একদিন মস্কোতে গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

তারপর চারটে বছরের একটানা বিশ্রাম। বিশ্রাম বললে ভুল বলা হয়, দীর্ঘ চারবছর মস্কোতে রোগের চিকিৎসা আর পড়াশুনায় ব্যস্ত রইলেন তিনি। যোগ দিলেন লেনিন ইনস্টিটিউটে। প্রাচ্য বিভাগের ছাত্রদের পড়ালেন ভিয়েৎনামের ইতিহাস। লিখলেন কবিতা।

তারপব ১৯৩৮ সালেব একদিন আবাব বেবিয়ে পড়লেন পথে। নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে আবাব শুরু হল পথ পরিক্রমা। ভিয়েৎনামেব স্বাধীনতাব স্বপ্নকে রূপ দিতে চীনে উপস্থিত হলেন তিনি।

চীন!

চীন ভিন্ন গতি নেই।

তাছাড়া চাবটে বছবে অনেক পবিবর্তন ঘটেছে পৃথিবীব। পবিবর্তন এসেছে একটি মানুষেব। জাপানীদেব ভয়ে চাব বছব আগেব চিয়াং কাই শেক তখন অন্য মানুষ।

দক্ষিণ চীনেব ইয়েমেনেতে এসে নতুন আস্তানা পাতলেন তিনি। যোগাযোগ কবলেন চীনা কম্যুনিষ্টপার্টির সঙ্গে। তাবপব কুয়োমিণ্টাংদেব গেবিলা যুদ্ধ শিখিযে দেওয়াব জন্যে চিয়াং কাই শেক যখন কম্যুনিষ্ট পার্টিব কাছে আবেদন জানাল তখন পুবানো বিবাদ ভুলে বাজি হল পার্টি। কুয়োমিণ্টাংদের গেবিলা যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়াব জন্যে জেনাবেল ইয়ংয়েব মিশন গেল। সঙ্গে গেলেন তিনি। তিনিই হলেন মিশনেব বাজনৈতিক উপদেষ্টা।

আর এখান থেকেই শুরু হল আব এক পথে যাত্রা।

সময়টা ১৯৪০ সালেব ফেব্রুয়াবী মাস।

ভিয়েৎনামের মাটিতে ফবাসীবা কম্যুনিষ্ট পার্টিব ওপব শুরু কবেছে তাদের উলঙ্গ আক্রমণ। অতর্কিতে গ্রামেব পব গ্রামে ঝাঁপিয়ে পডছে। টেনে বাব কবছে মানুষকে। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ। গর্জে উঠছে হাতের রাইফেল। শেষ কবছে কম্যুনিষ্ট। ভিয়েৎনামেব মানুষ কম্যুনিষ্ট। ভিয়েৎনামেব শিশুটিও কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্টদেব বাঁচিয়ে রাখা উচিত নয়।

কম্যুনিষ্ট ভীতিব নেশায় মেতে উঠে গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য কবে চলেছে তারা। শেষ কবে দিতে চাইছে ভিযেৎনামের যুব শক্তিকে।

পালাচ্ছে মানুষ। ভিয়েৎনাম ছেড়ে যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে।

ইয়েমেনে যাঁরা এলেন তাঁদের ডাক দিলেন তিনি। সে ডাকে তাঁরা কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখের দিকে চাইলেন।

নতুন এক মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন তিনি তাঁদের। একসঙ্গে ধ্বনি তুললো কণ্ঠ, ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ।

আমরা লড়াই করবো। আমরা বাঁচবো।

ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ!

১৯৩৮ সালেব একদিন দেশ থেকে বিতাড়িত কটি মানুষ তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ছিল। ভিয়েৎনামেব বিপ্লবকে জয়যুক্ত করাব শপথ নিয়েছিলেন তাবা। প্রতীজ্ঞা কবেছিলেন স্বাধীনতার রক্ত-পতাকা ভিয়েৎনামেব আকাশে তুলবেনই।

সেই প্রতীজ্ঞা পূর্ণ কবতে সাধনা শুরু হয়েছিল তাঁদেব। চীনেব মাটিতে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। শুরু হয়েছিল গেবিলা যুদ্ধেব শিক্ষার্থীব জীবন।

তাবপব একদিন শিক্ষা শেষে দেশেব পথে চলে এলেন তাঁবা। তিনি বইলেন। বললেন, দেশে ফেবাব সময় এখনও আসেনি। সময় যেদিন আসবে, সেদিন ঠিক পেঁীছে যাবেন দেশেব মাটিতে।

বিদায় দেবাব আগে নতুন দায়িত্বভাব তুলে দিলেন দুটি মানুষের ওপব। তাঁদেব একজন, ফাম শান ডং। অন্য জন ভো নগুয়েন গিয়াপ।

এই ফাম ভান ডং এব সঙ্গে প্রথম পবিচয় তাঁব ক্যান্টনে। ১৯২৫ সালে।

একদিন একটি অপবিচিত যুবক এসে তাঁব সামনে দাড়িয়েছিল। নাম তাব ফাম ভান ডং। পিতা হুয়েব আদালতেব উচ্চপদস্থ সরকাবী কর্মচাবী।

বলেছিলেন, আমার কাছে কেন?

আপনাকে দেখতে।

আমাকে দেখতে? গম্ভীব হয়েছিলেন তিনি। পর মুহূর্তেই

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিলেন। কারণ তাঁকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে ফাম ভান ডংয়ের মুখটি শুকিয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন অপরাধী অপরাধী দেখিয়েছিল তাকে। তাই হেসে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমাকে দেখার কিছু নেই।

আমি শুধু দেখতে আসিনি আপনাকে।

শুধু দেখতে আসনি? তবে কি করতে এসেছো?

না, ধরা দিতে এসেছি।

ধরা দিতে? কার কাছে? আমার কাছে?

আপনার আদর্শের কাছে।

আমার আদর্শ তো একটা অতি সাধারণ ভিয়েৎনামী কৃষক অথবা মজুরের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। আমার চিন্তাধারাও তাদেরই মত। আমার বুকের জ্বালাতো তাদের বুকেও দিন রাত্রি জ্বলছে।

জ্বলছে আমার বুকেও।

তিনি আবার চেয়েছিলেন তার মুখের দিকে। তাকিয়েছিলেন পোষাকের দিকে। ফাম ভান ডংকে বড় সুসজ্জিত বলে মনে হয়েছিল তাঁর। মৃদু হেসেছিলেন তিনি।

তার মনের কথা যেন ফাম ভান ডংও বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, এ সুচিতা টুকু দেব-দর্শনের জন্যেই।

যদি বলি বিলাসীতা?

আমি অস্বীকার করি না। প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করলে রীতি নীতি মেনে চলতে হয়। সে রীতি টুকুই মেনে চলছি আমি। এ টুকু পরিত্যাগ করতে মুহূর্তে দ্বিধাও জাগবে না।

কিন্তু প্রাচুর্য্য ত্যাগ করে কেন আসতে চাও?

তিনি কেন ত্যাগ করেছিলেন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য?

মানবের ব্যথা বেদনা তাঁর মনে বৈরাগ্য সঞ্চার করেছিল বলেই

তিনি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন জীবনের সখ আহ্লাদ আনন্দকে। বুঝেছিলেন ভোগের মাঝে জীবনের সাধনা সম্ভব নয়।

পরাধীনতার বেদনা তো কিছু কম নয়।

কিন্তু এযে কঠিন পথ।

পথ যদি সহজ সরল হয়, গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পায়ে যদি কাঁটা না বিঁধলো, পথের দুঃখের স্মৃতি যে স্মরণে আসবে না কোনদিন।

পারবে সে স্মৃতি বহন করতে?

আমি চেষ্টা করবো। আমার চেষ্টা যাতে আন্তরিক হয় আমি তার শপথ নিলাম।

শপথ নিয়েছিলেন ফাম ভান ডং। অগ্নি মন্ত্রে জীবনের চলার পথে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি দীক্ষিত করেছিলেন। হোয়াম পোয়ারের শিক্ষা শেষে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভিয়েৎনামে। হাতে তুলে দিয়েছিলেন গুরুদায়িত্ব। গ্রামের কৃষক মজুরদের মাঝে সেবা কার্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রতিটি নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন ফান ভান ডং। কৃতকার্য হয়েছিলেন। আর সেই কৃত কার্যের ফল স্বরূপ লাভ করেছিলেন স্বাধীন উত্তর ভিয়েৎনামেব প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব। আর গুরুদায়িত্ব পালনের কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনে।

আর ভো নগুয়েন গিয়াপ?

ভিয়েৎনামের সাধারণ এক স্কুল মাষ্টার।

কিন্তু আজ তিনি অসাধারণ। যে তিনি একদিন ক্লাসে বসে ছেলেদের ইতিহাস পড়াতেন রণনীতিতে আজ তিনি বিশ্বের চোখে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তিকে বার বার হেনেছেন কঠিন আঘাত। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁর আদেশে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈনিকের দল ওদের অতি আধুনিক অস্ত্রের গর্বকে ধূলিস্যাৎ করে

দিয়েছে। ওরা বুঝেছে অস্ত্র ওদের কিছু করতে পারবে না। বোমা, গুলি, নাপামের আগুণ ওদের স্পর্শ করেনা। মৃত্যু ওদের ভয় পায়। ওরা মৃত্যুঞ্জয়ী। ওরা বীর।

বীরের শক্তির উৎস তার অটুট মনোবলে। সেই উৎস সন্ধানীর নাম ভো নগুয়েন গিয়াপ। ভিয়েৎনামের প্রাণের আগুনকে তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তায় ছড়িয়ে দিয়েছেন দিকে দিকে।

বলেছেন, এ আমাদের বাঁচার লড়াই। আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হলে চলবে না। আমাদের বাঁচতে হবে। শেষ করতে হবে শত্রু। ভুল ত্রুটীর স্থান দিলে আমরা ভুল করবো। আমাদের প্রতিটি ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে আগে থেকে চুলচেরা হিসাবে বিচার করে দেখতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে স্থির লক্ষ্যে।

তবুও যদি মৃত্যু আসে, সে মৃত্যুকে আমরা গ্রহণ করবো কিন্তু মৃত্যুর আগের মুহূর্তে প্রাণশক্তি যতক্ষণ না নিঃশেষ হচ্ছে ততক্ষণ শত্রুকে আঘাত হানা থেকে বিরত হবো না।

কারণ আমাদের এই সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্যে। দাসত্বের বন্ধন মুক্তির শপথ আমাদের সফল করে তুলতে হবেই।

সৈনিক হয়েছেন ভো নগুয়েন গিয়াপ। হাতে তুলে নিয়েছেন অস্ত্র। সব কিছু তুলে ঝাপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার যুদ্ধে।

এই অস্ত্র, যুদ্ধ, মৃত্যুপণ সংগ্রাম এসব দিন কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি। পরাধীনতার অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে তিনি তাঁর আপন পথে এগিয়ে চলেছিলেন। দাসত্বের মাঝে বেঁচেছিলেন। চিন্তা করেছিলেন দেশের মুক্তির।

কিন্তু হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন তিনি।

গিয়াপ ভয় পেয়েছিলেন, ককিয়ে উঠেছিলেন, এ আপনি কী করছেন? আমি একজন শিক্ষক। ছাত্রকাল থেকে বই ভিন্ন আর যে কিছু হাতে তুলিনি আমি।

সে বইও আপনি নিজে তুলে নেননি হাতে। আপনার বাবা মা অথবা শিক্ষক তুলে দিয়েছিলেন।

গুলির শব্দকে আমি ভয় পাই।

বোমার আঘাত আপনাকে সহ্য করতে হবে।

আমি পারবো না।

আপনি বলছেন?

আপনি বিশ্বাস করুন……

বিশ্বাস করি বলেই তো হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সাহসী হচ্ছি।

আমি অতি সাধারণ একজন শিক্ষক।

শিক্ষকের জ্ঞান-স্পৃহা ছাত্রের চেয়ে বেশি হওয়াই উচিৎ। শিক্ষক যদি ভাবেন তাঁর ছাত্রকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি শিক্ষকতা করছেন, পাঠ গ্রহণের আর প্রয়োজন কী তাঁর? প্রয়োজন আছে। ছাত্রের শিক্ষাকাল সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, শিক্ষককে তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে হয়। প্রকৃত শিক্ষকেব যথাযথ দায়িত্ব পালন করা যে বড় কঠিন। আপনার পূর্ব জীবনের দায়িত্বভাব আপনার ওপব ন্যস্ত হল। আমি বিশ্বাস করি আপনি সফল হবেন।

উপযুক্ত পাত্রেই তিনি প্রতিটি দায়িত্বভার তুলে দিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন সাধনার। সাধনা ছাড়া তো সিদ্ধিলাভ হয় না। কঠিন সাধনার দ্বারাই তো সর্ব্বত্যাগী রাজপুত্র বুদ্ধত্ব লাভ কবেছিলেন। অহিংসার মন্ত্র প্রচার কবেছিলেন।

তাঁর সেই অহিংসার ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন মানুষ। শান্তি লাভ করেছিল। ধর্মকে কবেছিল জীবনমন্ত্র।

কিন্তু তার সেই ধর্মেব মাঝে অধর্মেব করাল-ছায়া বিস্তার করলো একদল ধর্মের ভেকধারী শয়তান। তারা যীশুর বাণীকে সম্বল করে হানা দিল শান্তি, মৈত্রী, মানবতার লীলাভূমি ভিয়েৎনামে। ছিনিয়ে নিল মানুষের অধিকার। পরাতে চাইলো শিকল।

তা কী হয়? হয় না।

সম্ভব হল না তাদের জঘন্য লিপ্সার স্বপ্নকে সার্থক করা। নির্বিচারে ভিয়েৎনামের মানুষ মেনে নিলনা তাদের অনধিকারের অধিকারকে। প্রতিবাদ জানাল। গর্জে উঠল কণ্ঠ।

খুলে পড়লো তাদের মুখোশ। ধরা পড়ে গেল তারা।

ধরা পড়ার পর শয়তানের দল তাদের শয়তানীর চরম প্রকাশ ঘটালো ভিয়েৎনামের বুকে। সবুট পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখতে চাইলো ভিয়েৎনামীদের প্রাণশক্তিকে। শুরু হল অকথ্য নির্যাতনের দিন। সহ্য করলো মানুষ, তবু মেনে নিল না পশুদের দাসত্ব।

ক্ষমতার গর্বে গর্বিত ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শেষ করে দিতে চাইলো একটা ছোট্ট দেশ, ছোট্ট একটা জাতিকে। ধ্বংস-স্তূপের ওপর রচনা করতে চাইলো স্মৃতির সৌধ।

হল না। সম্ভব হল না ওদের সাধের স্বপ্নকে সফল করা। গর্জে উঠল একটি কণ্ঠ। একটি রোগা শরীরের অধিকারী মানুষ বজ্রের হুঙ্কার তুললেন। বললেন, এমন থাকবে না। এদিন চলবে না। দিন আসছে। দিন বদলের পালা আসবেই।

সহকর্মীদের বিদায় দিয়ে বলেছিলেন, আমি আসবো।

দিন এলে আমি ঠিক ফিরে যাব।

এলেন তিনি। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পরে।

১৯১২ সালে 'লা টুশ ট্রেভিল' জাহাজে সায়গনের বন্দর থেকে সমুদ্রপথে একুশ বছরের এক তরুণ জীবনের পথ পরিক্রমা শুরু করেছিলেন। অপরিচিত পথে সহায়-সম্বলহীন যুবকটি মিশে গিয়েছিলেন পৃথিবীর জনারণ্যে কিন্তু হারিয়ে যাননি। নানান্ ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখে কষ্টে জীবনকে করেছেন অতিবাহিত। পথ খুঁজেছেন। পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন দিকে-দিকে। অবশেষে পেয়েছেন সে পথ।

নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে চললেন তিনি। পথচলার সঙ্গীরা কাছে এল। তাদের তিনি দু'হাতে বুকে টেনে নিলেন। আপন বুকের আগুনের স্পর্শ দিয়ে তাদের বুকেও জ্বালিয়ে তুললেন আগুন। সেই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাগুলিকে ফিরিয়ে দিলেন দেশের মাটিতে। বললেন, তোমরা যাও, আমিও যাব। আমার জন্যে অপেক্ষা করো তোমরা।

তিনি তাঁর কথা রাখলেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে সত্যই তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু লোকালয়ে নয়। ফিরে এলেন পাক বো-তে। এলেন পদব্রজে।

পাক বো শুধুমাত্র পাহাড় নয়। পাহাড়ের মালা। একের পর এক। কাও বাং থেকে টসিং টসি পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। সঙ্গে জঙ্গল। গভীর দুর্ভেদ্য। দিনের আলো সেখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়, চাঁদের আলোর একটি কণাও প্রবেশ করে না।

সেই পাক বো-র পাহাড়ে জঙ্গলে সঙ্গীদের নিয়ে বাসা বাঁধলেন তিনি। গোপনে সংবাদ পাঠালেন সহকর্মীদের কাছে। বলে পাঠালেন, আমি এসেছি, তোমরাও এসো।

এলেন তাঁরা।

পাক বো-র পাহাড় জঙ্গল মানুষের সমাগমে ভরে গেল।

এলেন হোয়াং ভান থু, ভো নগুয়েন গিযাপ, হং কুযোক ভিয়েট, ডু আং, ফাম ভান ডং আরো অনেকে। আজকের ভিয়েৎনামের বড় বড় নেতাদের সকলেই সেদিন তাঁর আহ্বানে ছুটে গিয়েছিলেন পাক বো-র পাহাড়ে জঙ্গলে।

১৯৪১ সালের ১০ই মে পাক বো-র পাহাড়ে ইন্দোচায়না কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম অধিবেশন বসলো। ইন্দোচায়না কম্যুনিষ্ট পার্টির নাম পরিবর্তন করে রাখা হল, ভিয়েৎনাম ডক-লাপ ডং মিন ; ভিয়েৎমিন।

গ্রহণ করা হল নতুন কার্যসূচী। পাক বো-র বিস্তৃত পাহাড় জঙ্গল নিয়ে গঠিত হল প্রথম মুক্ত অঞ্চল। গিয়াপের ওপর ভার

পড়লো গেরিলাবাহিনী গঠনেব। স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল আবো ব্যাপকহারে সমস্ত ভিয়েৎনামে ছড়িয়ে পড়ার। বিপ্লবের মন্ত্রপ্রচাব কবাব। মানুষকে শিক্ষিত কবে তোলাব। বিপ্লবকে জয়যুক্ত কবতে হলে প্রথম মানুষেব মনেব নিংক্ষবতাব অন্ধকার দূর করা প্রয়োজন।

ডাক দিলেন দেশেব সর্বস্তবেব মানুষকে। শুধু শ্রমিক কৃষক নয়, ধনী, দবিদ্র, শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পী-সাহিত্যিক, জমিদাব, ব্যবসায়ী, সৈনিক, বাজকর্মচাবী, ভিয়েৎনামেব প্রতিটি নবনাবীর কাছে তিনি আবেদন জানালেন।

জুন মাসে চীন থেকে বেতাব যোগে তাঁব সভাপতিব ভাষন প্রচাব কবা হল। সমাজেব প্রতিটি শ্রেণীব মানুষেব কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন...

ফবাসীদেব ক্ষমতাব দম্ভ চূর্ণ হয়েছে। হিটলাবেব নাৎসীবাহিনীব কাছে হেবে গিয়ে তাবা আমাদেব দেশকে জাপানীদেব হাতে তুলে দিয়েছে। ফবাসী শোষণেব পব জাপানী শাসন শুরু হয়েছে দেশে। আমবা দর্শক সেজে নীববে বসে আছি

কিন্তু কতদিন? আব কত দিন এই অন্যায় শোষন আব শাসন ভোগ কবব?

আব কত দিন আমবা আমাদেব প্রতি জহ্লাদদেব অত্যাচাবকে নীববে মেনে নেব?

কতদিন?

আমবা কী অন্ধ, আমবা কী অক্ষম· ভীরু দুর্ব্বল কাপুরুষেব মত মুখ বুজে সব কিছু দেখবো, প্রতিবাদ জানাবো না? প্রতিকাব করব না?

না আব নয়। চুপ কবে আমবা থাকবো না!

মুক্তি যোদ্ধাবা শোন, লগ্ন বহে যাচ্ছে। লড়াইয়েব ঝাণ্ডা আকাশে

তুলে ধরো। পিতৃভূমিব পবিত্র আহ্বানে সাড়া দাও। শপথ নাও।

হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি।

ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদেব।

শত্রুব বক্তে মুছে দাও জাতিব কলঙ্ক, অপমান, অপবাদ। বুকে হাত দিয়ে স্মবণ কবো অতীতকে। ভিয়েৎনামেব অতীত। অতীতেব ভিয়েৎনামীদেব শৌর্য্য-বীর্য্যকে।

প্রমাণ কবো আমবা ভীরু নই কাপুরুষ নই।

আমবা আমাদেব পিতৃভূমি ভিয়েৎনামেব জন্যে প্রাণ দেব। আমবা জয়ী হবো।

ভিয়েৎনাম বিপ্লব জয়যুক্ত হবেই।

পৃথিবীব বিপ্লব জয়যুক্ত হবেই।

ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ।

জাতির উদ্দেশে একটি উদাত্ত কণ্ঠ আহ্বান জানাল। জেগে উঠতে বললেন ভিয়েৎনামেব প্রতিটি মানুষকে। ছিন্ন কবতে বললেন পবাধীনতাব শৃঙ্খল।

তাবপব আবাব বেরিয়ে পডলেন তিনি।

নগুয়েন আই কুয়োক নন এবাব হো চি মিনেব যাত্রা শুরু হল। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ একটি মানুষ আবাব বেবিয়ে পডতে চাইলেন পথ পবিক্রমায়।

সহকর্মীবা ফেবাতে চাইলেন। বাধা দিলেন। কিন্তু সে বাধা তিনি মানলেন না। যেতে যে তাঁকে হবেই। বন্ধুদেব মন থেকে দূব কবতে হবে অভিমানেব বাষ্প। কাবণ মার্ক্সেব নীতিকে তিনি মানেন নি, তিনি কম্যুনিষ্টদেব নীতি থেকে দূবে সবে এসেছেন, তিনিও ডাক দিয়েছেন শ্রমিক, কৃষক, বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, জমিদাব-

দেরও ; এ অভিযোগ তাঁরা করতে পারেন। তাঁরা ভাবতে পারেন তিনিও বুর্জোয়া বনে গেলেন।

সে ভুল তাঁকে নিজে গিয়ে সংশোধন করতে হবে। তিনি তার নীতিতে তেমনি বিশ্বাসী।

তবে কেন তিনি ডাক দিলেন ওদের ? ওরা যে নীতি বহিঃর্গত মানুষ। ওদের বিরুদ্ধেই তো সংগ্রাম।

না তা নয়। ভিয়েৎনামের সংগ্রাম ধনী দরিদ্রের নয়। সে সংগ্রামের দিন যদি আসে তিনি সংগ্রাম করবেন। আগে প্রয়োজন স্বাধীনতা। বিদেশী শত্রুদের দূর করতে হবে। যাদের শাসনের জাঁতাকলে ধনী দরিদ্র সবাই সমান ভাবে পিষ্ট হচ্ছে। দেশভক্ত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে আগে।

সহকর্মীদের বললেন, নাইবা আমি রইলাম। আমিতো একদিন থাকবো না। সেদিন কী বন্ধ হবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ? আপনারা কী আমার না থাকার জন্যে থেমে যাবেন ? মেনে নেবেন অত্যাচার ?

না।

তবে ? নাইবা রইলুম আমি। আপনারা লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যান। বিপ্লবের পথ যেন রুদ্ধ গতি না হয়। আমি আবার আসবো। আপনাদের মধ্যেই ফিরে আসবো আমি।

এগিয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গীরা বিদায় দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। একবার পিছন ফিরে দেখলেন তিনি। হাসলেন। হাত নেড়ে বিদায় জানালেন আবার।

এক সময় পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর দেহটা।

নাম, হো চি মিন।

পেশা, ভিয়েৎনাম প্রবাসী চীনা সাংবাদিক।

স্থান, ভিয়েৎনাম সীমান্ত পার হয়ে চীনের কুয়োমিণ্টাং এলাকা।

ধরা পড়ে গেলেন তিনি। ধরল কুয়োমিনটাংরা। চৌ-এন-লাই, চিয়াং কাই শকের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। স্থান হল কুয়োমিণ্টাংদের বন্দী শালায়।

অথচ সে সময় চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে চিয়াং কাই শেকের কোন গণ্ডগোল নেই, বরং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাপানী আক্রমণকে প্রতিরোধ করছে চিয়াং কাই শেক। তবু বন্দী করা হল তাঁকে। বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল জেলখানায়।

জেলখানা।

জেলখানার অভিজ্ঞতা নতুন নয়। ১৯৩৩ সালে হংকংয়ে বৃটিশ জেলে একবার স্থান হয়েছিল তার। সেবারের বন্দী জীবন তাঁর সুখে কাটেনি। নির্যাতন সেবারও কিছু কম হয়নি তার ওপর। কিন্তু সেবারের সঙ্গে এবারের দুস্তর প্রভেদ। চিয়াং কাই শেকের জেলখানা নয়, নরক। বন্দীদের পরিচয় তারা বন্দী, অপরাধী। শাসকশ্রেণীর বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে দণ্ড ভোগ করতে আসে জেলখানায়।

তাঁর অপরাধ যে কী তা তিনি জানেন না। চিয়াং কাই শেক তাঁর বন্ধু। বন্ধুর কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে এসেছিলেন তিনি। এসে-ছিলেন ভিয়েৎনামের মুক্তি যুদ্ধে, যাতে মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিতে পারেন—তার জন্যে। বন্ধুর কাছে তিনি ভিক্ষা চাইতেন। বলতেন, বন্ধু অস্ত্র দাও। আমার পিতৃভূমির মুক্তি আন্দোলনে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

কিন্তু সাহায্য মিলল না। লাভ করলেন বন্দীত্ব। অসংখ্য বন্দীদের মাঝে তিনিও একজন হয়ে গেলেন। হাতে পায়ে পরানো হল লোহার শিকল, পরণে লজ্জা নিবারণের জন্যে শুধু একখণ্ড বস্ত্র। তার অতি প্রিয় ররাবের স্যাণ্ডেল জোড়াও কেড়ে নেওয়া হল।

রাতের অন্ধকার ম্লান হচ্ছে। পূবের আকাশে আলোর ইশারা। সূর্য ওঠার লগ্ন সমাগত।

চিয়াং কাই শেকের জেলখানার বন্দীরা দাঁড়িয়েছে সারিবদ্ধভাবে। একের পর এক। গলায় তাদের লোহার তারের বন্ধন। একের সঙ্গে অন্যের।

তাদের মধ্যে তিনিও একজন। চিয়াং কাই শেকের বন্দীশালায় নগণ্য এক বন্দী। পৃথক পরিচয় নেই। একমাত্র পরিচয় তিনি বন্দী।

বন্দীরা চলেছে। মাইলের পর মাইল। মাথার ওপর মধ্যাহ্নের অগ্নিঝরা সূর্য। পথশ্রমে পিপাসায় কাতর প্রাণ। বিশ্রাম নেই। বন্দীদের প্রতি নেই কোন দয়া মায়া মমতার স্থান।

শুধু এগিয়ে চল। এগিয়ে চল। থামলে চলবে না। পিপাসায় যদি বুক ফেটে যায় জল পাবে না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মুক্ত করা হবে গলার বাঁধন। দেওয়া হবে খাদ্য পানীয়। অতি নিকৃষ্ট আহার। যদি প্রবৃত্তি না হয় খেওনা। কিন্তু পরদিন আবার পথ চলতে হবে। পৌঁছাতে হবে এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায়।

পরদিনের কথা চিন্তা করে বন্দীর দল সেই অখাদ্যই খায়। খেতে বাধ্য হয়। প্রথম কারণ ক্ষুধার জ্বালা। দ্বিতীয়, পরদিন পথ চলার বিভীষিকা।

পথের আনন্দেই পথ চলা। কিন্তু বন্দীদের জীবনে সে আনন্দ মুহূর্তটুকু আসে না। মুছে যায় পারিপার্শিকতাটুকু। প্রকৃতির মুক্ত মেলায় দৃষ্টি সঞ্চালনের অবসর হয় না। পথ, শুধু পথ। এ পথের

শেষ কোথায়? কত দূব? আর কত দূর? বাত্রির মুক্তি লগ্নের আর কত দেরী?

দেরি নেই। আর দেবি নেই, মুক্তি-লগ্ন সমাগত।

পা ওঠে না। দুটি পায়ে যেন পাষাণ ভার। মাথা ঘুবছে, পা টলছে। পথেব মাঝেই লুটিয়ে পড়ে কোন বন্দী।

ওরা ছুটে আসে হৈ-হৈ কবে। বাইফেলধারী চিয়াং কাই শেকের শাকরেদের দল। বন্দীকে উঠতে বলে। আদেশ জানায়।

কিন্তু উঠবে কে। যে পড়ে, শবীরের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষিত হবার পরই সে পড়ে। যতক্ষণ দেহে শক্তি থাকে দাঁড়ায় না, পথ চলে, চলতে বাধ্য হয়

ভূপতিত বন্দীকে বন্ধন মুক্ত কবে ওরা। নিয়ে যায় একটু দূরে কোন ঝোপেব আড়ালে অথবা টিলার পাশে। ফিরে আসে রক্তমাখা ছুরি মুছতে মুছতে। বন্দী মুক্ত হয়ে চলে যায় চিবদিনের মত।

আবার শুরু হয় পথ চলা।

পথ শেষ হতে তখনো যে অনেক দেরি।

বন্দী, তুমি এখনও জেগে আছো?

হ্যাঁ, বন্ধু।

তুমি ঘুমাবে না?

ঘুম আসবে না আজ আমার চোখে।

তুমি তো প্রতি রাতই জেগে পাব করে দাও, ঘুমাও না?

আমি ঘুমাতে পারি না বন্ধু

কেন?

আমি যে বন্দী। বন্দীর যন্ত্রণার তো শেষ নেই। সেই যন্ত্রণা আমাকে ঘুমাতে দেয় না। সেই জন্যেই আমি জেগে থাকি।

দিনের পর দিন?

আমি বছরেব পর বছর জেগে আছি। বছরের পর বছর আমি শুধু ছটফট করছি। আমি ঘুমাতে চেয়েছি, পারিনি। আমি ভেবেছি কেন আমি ঘুমাতে পারিনি? আমার আত্মা বলেছে, বন্দীর ঘুমাবার কোন অধিকার নেই।

এসব কী বলছো তুমি?

আমি সত্যি কথাই বলছি বন্ধু।

এও কী সম্ভব, দিনেব পব দিন তুমি না ঘুমিয়ে আছো? কঠিন পরিশ্রমে মানুষের শবীব মন দুইই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চাই বিশ্রাম। বিশ্রামে দূব হয় ক্লান্তি। তুমি কী ক্লান্ত হও না? তোমার শরীর কী প্রতিদিনের এই অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না?

নিশ্চই আমি ক্লান্ত হই বন্ধু।

তবু তুমি ঘুমাও না কেন?

আমি যে ঘুমাতে পারি না। ক্লান্তিতে আমাব দেহ যখন অবশ হয়, চোখেব পাতা বুজে আসে তখন কে যেন আমাকে ধিক্কার দিয়ে জাগিয়ে দেয়, বলে, ঘুমাতে লজ্জা করে না তোমাব? আমি জেগে উঠি। লজ্জায় আমাব মাথা নত হয়। আমি মুখ তুলতে পারি না।

তুমি তাহলে মানুষ নও। তুমি……

না বন্ধু, আমিও মানুষ। তোমাবই মত একজন মানুষ আমি।

তুমি কী কোন দিন ঘুমাবে না?

নিশ্চই ঘুমাবো বন্ধু। ঘুমাবার দিন যদি আসে সেদিন নিশ্চই আমি ঘুমাবো। কিন্তু তার আগে নয়। তার আগে ঘুমাবার কোন অধিকার আমাব নেই। এখনো অনেক পথ আমাকে অতিক্রম কবতে হবে। পাব হতে হবে দুস্তব মরুব ব্যবধান। মুক্তি আলোয় যেদিন ভিয়েৎনামের আকাশ প্লাবিত হবে, নিভয়ে মাথা উচু করে মানুষ এগিয়ে যাবে তোমা কম পথে। প্রেমিকার চোখে কাঁপবে

স্বপ্নেব ছোঁয়া, শিশুরা খেলবে মায়ের কোলে, মন্দিরে বাজবে পূজার ঘণ্টা, সেদিন নিশ্চয়ই আমি ঘুমাবো।

আর আজ ?

আজ ?

দেহ কারাগারে বন্দী
মন পলাতক বাইরে বাঁধন-মুক্ত ;
যা কিছু মহৎ তারই বাস্তব রূপায়ণে চাই আত্মার
প্রসারতা আর ঠাণ্ডা মাথাব ধৈর্য।

জান বন্ধু, ওরা আমার হাতে পায়ে লোহার শিকল পরিয়েছে। কিন্তু আমার মনকে ? আমাব মনকে বন্দী করতে পাবেনি। আমি জানি আমার মনকে ওরা বন্দী কবতে পারবে না। সে সাধ্য ওদেব নেই।

ওরা আমার হাতে পায়ে পবিয়েছিল লোহার শিকল
বন্দী করে আমাকে কি করবে বিকল ?
পাহাড় পথে হাঁটার সময়
নিশ্চিন্তেই শুনি কিন্তু পাখির গান
আবাব দেখি, অবণ্যতার গভীরতায়
কী মমতায়
ধরেছে তার
বসন্তের এ রঙ বাহাব।
তখন ওবা বুঝেছে কি
এই একজন
মানুষ এখন
বন্দী নয়—মুক্ত প্রাণ!

জান বন্ধু, আমি স্বপ্ন দেখি। অন্ধকার এ কাবাগৃহ আমার চোখে

আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। আমি স্বপ্ন দেখি। কী স্বপ্ন আমি দেখি জান?

বরং মৃত্যু ভাল দাসত্বের চেয়ে। আমার স্বদেশে ঘরে ঘরে
লালে লাল পতাকারা আবার ঊর্দ্ধে উড়ছে।
হায়! এ সময়ে জেলখানায় বন্দী হয়ে দিন কাটানো!
কবে মুক্তি পাবো, কবে ঝাপিয়ে পড়বো যুদ্ধে?

বন্ধু, আমি প্রতীজ্ঞা করেছি।

মার খাওয়া বোবায় ধরা দুঃখগুলো
হটিয়ে দেব অনেক দূরে, সূর্যের রক্তাক্ত সংগ্রামে।
লড়াই-লড়াই, আজ শুধু বাঁচার লড়াই
রাইফেল মর্টার এবং বারুদের বিস্ফোরণ।

লড়াইয়ের কথাও বলেছেন তিনি। জেলখানার কবিতায় তাঁর কবি-মন সংগ্রামের ছবি এঁকেছে। সেই ছবিই যে একদিন বাস্তবে রূপ নেবে, একটা জাতির জীবনে লড়াইয়ের বিভীষিকা চিরদিনের জন্যে চাপিয়ে দেবে, আজকের সভ্য দুনিয়ার মানুষ, যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে, তারা বুঝি কল্পনাও করতে পারে না সেই মর্মান্তিক চিত্রের কথা।

মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। ছোট্ট দেশটা, মানুষের মনুষত্বের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু কী পেলেন? কী দিল ওরা? সভ্য জগতের মানবতার ধ্বজাধারী মানুষগুলো?

ওরা কি মানুষ, না মনুষ্য চর্মাবৃত কোন আদিম যুগের হিংস্র পশু। যাদের পরিচয় পৃথিবীর বিবর্তনে লুপ্ত, কিন্তু গোপন অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। ওদের মনের মধ্যে সেই অন্ধকার যুগের নরখাদক হিংস্র পশুরই তো ছায়া। সেই পশুত্বের প্রকাশ তো ওদের পরিচয়ে।

ওদেরই চক্রান্তে একদিন দেশটাকে দুভাগ করা হয়েছিল। স্বাধীন হয়েছিল উত্তর কিন্তু দক্ষিণের বুকের আগুন নেভেনি। শয়তানের পায়ে দাসখত লিখে দিতে রাজি হয়নি তারা। সংগ্রাম চালিয়েছিল আগের মতই কারণ মুক্তির পরিবর্তে দাসত্বের শৃঙ্খলে নতুন করে বাঁধা হয়েছিল তাদের। সেই বন্ধন মুক্তির শপথ নিয়েছিল তারা নতুন করে।

ফলে আবার বহেছিল অত্যাচারের বন্যা। মহামান্য বাও দাই, নো দিন জিয়েমের রক্ষাকর্তা আমেবিকা অবতীর্ণ হয়েছিল শয়তানেব ভূমিকায়। তারা শক্তিমান। পৃথিবীতে আজ তাবাই হয়তো প্রধান শক্তির অধিকাবী। সেই প্রাধান্যটুকু বজায় রাখতে তাবা দক্ষিণের ঘরে ঘরে তুলেছিল হাহাকাব। গ্রামকে গ্রাম মরুভূমিতে পবিণত করেছে। নিষ্পত্র করেছে গাছেব পাতা। মাটির বুককে করেছে শুষ্ক কঠিন। যেখানে একদিন ফুল ফুটতো সেখানে আজ ঘাসও জন্মায় না। যে শিশু খেলে বেড়াতো তাব আজ জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রাকে কবে তুলেছে অসুস্থ। মহামারীর সৃষ্টি করেছে ঘবে-ঘরে। কেন? না, মানুষ চায় অধিকার। ভিয়েৎনামের মানুষ বাঁচতে চায়। তারা শান্তি চায়।

নিজের ঘবে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ভিয়েৎনামেব বুকে আজ আমেরিকার বীভৎস অশান্তির লীলা। সে চায়না মানুষ সুখ শান্তি ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকুক, স্বপ্ন দেখুক। কারণ তার স্বপ্ন শেষ। সে আজ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। শেষ মনুষত্বটুকু বিকিয়ে দিয়েছে পশুত্বে। সে মনে করে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

কিন্তু, তাকি হয়? হয়না। হয়নি।

ভিয়েৎনাম তার যোগ্য জবাব দিয়েছে, দিচ্ছে। প্রাণশক্তিতে পূর্ণ দেশটার মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে সমানে। পশুত্বকে স্বীকার তারা করবে না।

তারা বাঁচবে, নিশ্চই বাঁচবে। বাঁচার অধিকার তারা শক্ত হাতে ছিনিয়ে নেবে। কারণ তারা যে ফিরে পেয়েছে তাদের লুপ্ত মনোবল। তিনি যে নিদ্রার সমুদ্র থেকে জাগরণের তটে উত্তরণ করিয়েছেন একটা সমগ্র জাতিকে।

তিনি যে বলেছেন,

দেহ যদি বাঁধা পড়ে লোহার পিঞ্জরে
মন কারও বাঁধা নয় কোন কারাগারে।

ভিয়েৎনামের প্রাণকে বন্দী করে রাখে তেমন কারাগার কোথায়?

মুক্তি তিনিও পেলেন। দীর্ঘ কটা মাসের অশেষ যন্ত্রণার পর মুক্তি এল। বিনা মূল্যে নয়। মূল্য তাঁকেও দিতে হবে।

চ্যাং ফা কুয়ে। চিয়াং কাই শেকের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর। অনেক কু-কীর্তির অধিকারী। চিয়াং কাই শেককে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বার বার লেলিয়ে দিয়েছে। ১৯২৮ সালে ক্যান্টনে চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে যে কম্যুনিষ্ট নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে চ্যাং-এর হাত কম ছিল না।

পরে যুদ্ধ শুরু হতে আবার কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিল চিয়াং কাই শেক। কারণ জাপানীদের হাতের মারটা বড় সুখকর নয়।

এই সুযোগে এগিয়ে এল আমেরিকা। চীনের ওপর একনজর দিল সে। চিয়াং কাই শেককে লোভ দেখাল। যুদ্ধ শেষে ভিয়েৎনামকে তারই হাতে তুলে দেওয়া হবে।

একদিন ভিয়েৎনাম ছিল চীনের অধীন। কিন্তু সেই অধীনতা ভিয়েৎনামীরা বুকের রক্তের বিনিময়ে ছিন্ন করেছিল। দীর্ঘ দিনের সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল তারা। মুক্ত করেছিল দেশকে।

চিয়াং কাই শেক বুঝেছিল ভিয়েৎনামকে বন্দী করে রাখা সম্ভব নয় যদি না ভিয়েৎনামের মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করা যায়।

অত্যাচারে জাতীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না, শক্ত কঠিন হয়ে ওঠে। দুর্ব্বার হয়ে ওঠে তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তাকে তখন শত আঘাতেও শেষ করা যায় না।

চাই বিশ্বাসঘাতকের দল। দেশের মাজে বাস করেও যারা, দেশের সমাজের ভাল চাইবে না, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করবে না। দেশ জাতি রসাতলে যাক, তারা তাদের আপন স্বার্থে মশগুল থাকবে, বিত্ত বৈভবের স্বপ্ন দেখবে। আপন দেশের মানুষের দুঃখে প্রাণ কাঁদবে না, অত্যাচার বুক বাজবে না। দেশের নারীর সম্মান শুধু নয়, আপন নারীর সম্মানও যদি ধূলায় লুটিয়ে পড়ে তবু তারা চোখ বুজে থাকবে। অর্থ হবে তাদের জীবনের মোক্ষ। তাদের জীবনের একমাত্র চিন্তা কামনা ঐশ্বর্য্যে। ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে সবই লাভ করা সম্ভব এই হবে জীবনের একমাত্র সত্য।

যেমন ভিয়েৎনামের খ্রীষ্টানের দল। তারা প্রতিটি সুযোগ সুবিধা পায়। দেশ স্বাধীন কী পরাধীনতা তাদের মনে কোন ঝড় তোলে না। ভিয়েৎনামী হয়েও তারা যেন আলাদা। ভিয়েৎনামীদের প্রতি অত্যাচারে তারা তাই নীরব।

হয়তো সকলে নয়। ভিন্নধর্ম গ্রহণ করলেও অনেকের মনই হয়তো আজকের এই বর্বরতাকে সমর্থন করে না। তাদের প্রাণ কাঁদে। প্রতিবাদে গর্জে উঠতে চায়।

কিন্তু কজন তারা? কজন ভিয়েৎনামী খ্রীষ্টান আজ দেশ আর জাতির জন্যে ব্যথিত দুঃখিত? দু-একজন। তাও প্রতিবাদ জানাতে পারে না ভয়ে। জাতি নয়, ধর্ম আজ ভিয়েৎনামের মানুষকে পৃথক করেছে। সে ধর্মের নাম খ্রীষ্টধর্ম।

চিয়াং কাই শেক ভিয়েৎনামে বিশ্বাসঘাতকদের দল তৈরি করল। সে দলের নাম ভিয়েৎনামী বিপ্লবী লীগ। সে দলের নেতা হলেন নগুয়েন হাই থান।

নগুয়েন হাই থান!

অতীতের জাতীয়তাবাদী নেতা নগুয়েন হাই থান!

একদিন যিনি দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিদেশী শাসকের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে দেশের মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন। লাভ করেছিলেন নির্বাসন। তাঁর দেশসেবার পুরস্কার।

সেই তিনি, নগুয়েন হাই থান নাম লেখালেন চিয়াং কাই শেকের বিশ্বাসঘাতকদের নামের তালিকায়। যারা শুধুমাত্র নিজের সুবিধার জন্যে দেশকে অন্যের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না। দেশের চেয়ে আপন স্বার্থ হবে যাদের কাছে বড়। তাদের নিয়ে দল তৈরী করবে।

নগুয়েন হাই থান তাঁর বৃদ্ধবয়সে মানুষের মনের সম্মানের আসন থেকে নেমে দাঁড়ালেন। হয়তো চিয়াং কাই শেকের ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন।

দল গঠন হল। শুরু হল কাজ। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না ঠিকমত। সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হলেন নগুয়েন হাই থান।

ঠিক এমনি সময় দৃষ্টি পড়লো তাঁর ওপর। নগুয়েন আই কুয়োক। আজকের হো চি মিন।

তিনি তখন বন্দীর দুঃসহ জীবন যন্ত্রণায় ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষত-বিক্ষত। তবুও তাঁর কবি-মন বলেছে…

বাইরে ঋতুর পরিবর্তনে দিন আসে যায় বন্দীর
সে শুধু একটি স্বপ্নই দেখে, কোনদিন হবে মুক্ত!

মুক্তির বারতা নিয়ে হাজির হল চ্যাং ফা।

বলল, আমি আপনার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছি!

আমার মুক্তি! হয়তো আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি। না তিনি তো শুধুমাত্র নিজের মুক্তির কথা চিন্তা করেন নি। অমন স্বার্থপর তিনি নন আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ কোনদিনই কামনা করেননি। তিনি চেয়েছেন ভিয়েৎনামের মুক্তি। দুঃশাসনের দলকে ভিয়েৎনামের মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে। ভিয়েৎনামীদের মুক্তি তাঁর কাম্য।

আর সেই জন্যেই তিনি দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরেও আবার বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। সাহায্যের আশায়। বন্ধু চিয়াং কাই শেকের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতেন। সাহায্যের আবেদন জানাতেন।

কিন্তু বন্ধু পূর্ব স্মৃতি ভুলে গিয়ে বন্দী করলে তাঁকে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখল জেলখানায়। বহুবার তিনি আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কে তাঁর বন্ধু, চিয়াং কাই-শেক? মিথ্যা কথা। বন্দীর মাথার গণ্ডগোল আছে। একটা দীন বন্দী কখনো মহামান্য চিয়াং কাই শেকের বন্ধু হতে পারে?

'পারে না।

সত্যই পারেন না। শয়তানের বন্ধু কখনো মানুষ হয় না। শয়তান মানুষের ছদ্মবেশ ধরে, মানুষকে ভোলায়। তার বিবেক বুদ্ধি মনুষত্ব সব কেড়ে নিয়ে চরম সর্বনাশ করে।

তিনিও কী তাই করবেন? শয়তানের বন্ধুত্বের ছলনায় ভুলে মনুষত্ব বিকিয়ে দেবেন?

চ্যাং বলল, চিয়াং কাই শেক আপনার সাহায্য প্রার্থী।

সামান্য এক বন্দীর কাছে সাহায্য প্রার্থী চিয়াং কাই শেক! একি কখনো সম্ভব? তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি কথাটা। মনে হয়েছিল ভুল শুনেছেন।

চ্যাং বলেছিল, সেই জন্যেই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আমার কাছে কেন?

তিনি আপনার সাহায্য চান।

কিন্তু মহামান্য চিয়াং কাই শেককে সাহায্য করার ক্ষমতা আমার কোথায়?

তাঁকে সাহায্য করতে একমাত্র আপনিই পারেন। আপনার সে ক্ষমতা আছে।

কিন্তু আমি জানি আমার কিছুই নেই। আমি নিঃস্ব রিক্ত।

কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন, আমাকে সাহায্য করতে একমাত্র নগুয়েন আই কুয়োকই পারেন।

কী সাহায্য তিনি আমার কাছে আশা করেন?

ভিয়েৎনামী বিপ্লবী লাগের সমস্ত দায়িত্ব তিনি আপনার ওপর তুলে দিতে চান।

যথা।

দল পরিচালনার ভার আপনার। সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি আপনাকে দেবেন। আপনি আপনার ইচ্ছা মত কাজ করতে পারবেন

চিন্তা করার সময় চেয়েছিলেন তিনি। বিদায় নিয়েছিল চ্যাং।

কটাদিন সমানে চিন্তা করেছিলেন তিনি। দিনরাত্রি। সদা সবক্ষণ।

বারবার বাধা পেয়েছিলেন। সে বাধা এসেছিল মনের কাছ

থেকে। তাঁব আজন্মেব নীতি থেকে চ্যুত হওয়াব ভয় পেয়েছিলেন। এই কী তাহলে সত্য হবে, সত্যিই তিনি বিশ্বাসঘাতকে পবিণত হবেন ?

না-না, তা হয়না। তা তিনি পাববেন না। তাঁব আজন্মেব বিশ্বাসেব অপমৃত্যু ঘটতে তিনি দেবেন না। তাঁব বদনাম হয়ে যাবে। ভিয়েৎনামেব মানুষ বলবে হো চি মিন বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে। তাদেব ঠকিয়েছে।

হো চি মিন ঠগ্।

অর্থ চাই। সাহায্যেব আশায় তিনি চীনে ছুটে এসেছিলেন। যে স্বাধীনতা তাঁব জীবনেব একমাত্র স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন সার্থক কবতে হলে অর্থেব একান্ত প্রয়োজন। অর্থ ভিন্ন মিলবে না আগ্নেয়াস্ত্র। এ ছাড়া আবো নানান কাজে অর্থেব প্রযোজন। সেই প্রয়োজন মেটাতেই তাঁব ছুটে আসা।

রাজি হলেন তিনি।

দায়িত্ব নিলেন ভিয়েৎনাম বিপ্লবী লীগেব। বিনা দ্বিধায় চিযাং কাই শেক তুলে দিলেন অর্থ। প্রচুব অর্থ। মাসেব পব মাস। মানুষকে শয়তানে পবিণত কবতে গেলে হিসাব বাখলে চলে না।

তুলে দিলেন অস্ত্র, গোলা বারুদ। সেই সমস্ত অস্ত্র গোপন পথে পাচার হয়ে এসে হাজিব হতে লাগল গিয়াপেব হাতে। সেই সমস্ত অস্ত্রের সদ্ব্যবহাব কবতে লাগলেন গিয়াপ। চোবা গোপ্তা আক্রমণেব মাত্রা বেড়ে চলতে লাগল দিনেব পব দিন।

যুদ্ধের বণদামামা তখন সমানে বেজে চলেছে। জাপানীবা ভিয়েৎনাম অধিকাব কবলেও সুস্থিব হয়ে বসতে পাবেনি। ভিয়েৎ-নামের ফবাসীবা চিন্তিত। কাবণ ফ্রান্স তখন উত্তাল। কায়েমী স্বার্থেব বিরুদ্ধে দ্য গল তীব্র আন্দোলন শুরু কবেছেন। মার্শাল পেঁতোব সবকাব দিশাহাবা। দ্য গলেব ব্যক্তিত্বেব কাছে ক্রমশঃ

নিস্তেজ হয়ে পড়েছে ভি চি সরকার। সমস্ত ফ্রান্স জেগে উঠেছে। চরম আঘাত হানতে উদ্যত। হয়তো যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে। ফ্রান্সের রাজপথে বয়ে যাবে রক্তের বন্যা।

গিয়াপের ভিয়েৎমিনবাহিনী মরিয়া। বহুদিনের শত্রু ফরাসীদের তারা হাতে পেয়েছে। একটু অসতর্ক হলেই ঝাপিয়ে পড়ছে তাদের ওপর। কেড়ে আনছে গোলা বারুদ যা পাচ্ছে তাই।

ফরাসীদের দুর্দ্দশায় মানুষ খুশি। বহুদিনের শত্রুর ওপর দেশের একদল মানুষ প্রতিশোধ নিচ্ছে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল তারা। ক্রমে ক্রমে সমর্থনের সুর প্রকাশ্যে দেখা দিল। ভয়ের দিন যেন শেষ হয়েছে তাদের। তারা সাহসী হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

তাছাড়া যারা ফরাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের অস্থির করে তুলছে, দেশের মানুষের প্রতি ব্যবহার দেখলে কে বলবে এরা গেরিলা। ওরা যেন সকলের ভাই বন্ধু আত্মীয়।

কোন পরিচয় নেই। হয়তো দেখেওনি কোনদিন। তবু সাহায্য করতে এগিয়ে এল একটি যুবক। বিনীতভাবে জানাল আবেদন। সে সাহায্য করতে চায়।

সাহায্যের আবেদন জানায় সাহায্য-প্রার্থী। ওরা তার উল্টো। ওরা নিজেরাই এগিয়ে আসে। সাহায্য করতে চায়। চায় কাজ।

তোমরা এমন কেন?

কেমন হাসে ওরা।

আমরা তো সাহায্য চাইনি।

তবু আমরা সাহায্য করা কর্তব্য মনে করছি।

কেন?

আমরা কাজ চাই। কেন আপনারা একা পরিশ্রম করবেন? আমরা আপনাদের পরিশ্রম লাঘব করতে চাই।

কিন্তু সব সময় তো তোমাদের পাবো না। মিছিমিছি আমাদের অভ্যেসটা খারাপ হয়ে যাবে।

হাসে ওরা। বলে, সব সময় আপনারা আমাদের পাবেন। আপনাদের সেবার জন্যে আমরা সব সময় প্রস্তুত। আপনারা না ডাকলেও আমরা আসবো। কারণ এ আমাদেব জীবনের ব্রত। আমাদের অনুরোধ, ব্রত পালনে দয়া করে আপনারা আমাদের বাধা দেবেন না।

কিন্তু তোমাদের আমরা বিশ্বাস করবো কেমন কবে?

বিশ্বাস করার কী প্রমাণ আপনারা চান?

মনে কর তোমরা কোন অন্যায় করলে? সে অন্যায়ের প্রতিকার কী করে হবে?

নিশ্চই হবে। আপনাদের প্রতি আমরা যদি কোন অন্যায় করি তার ক্ষমা নেই।

শাস্তি পেতে হবে?

আমাদের অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মনে করুন, আমরা কোন অন্যায় করলুম না তবু আপনারা আমাদের যার কাছে হোক মিথ্যা অভিযোগ জানালেন, আমাদের মুক্তি নেই। আপনাদেব ওপরই আমাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে।

কেন?

আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই। বিদেশীর কবল মুক্ত করতে চাই দেশকে।

যদিও সে স্বাধীনতা আমাদের একার সংগ্রামে সম্ভব নয়। চাই আপনাদের সাহায্য, সহযোগিতা, কারণ আমরা জানি, আপনারা যদি আমাদের সাহায্য না করেন, আমাদেব পাশে না দাঁড়ান, তাহলে দেশের শত্রু, মানবতার অত্যাচারীদের বর্বরতার শাস্তি দেওয়া আমাদেব পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা কী করবো ?

আপনারা যদি ইচ্ছা করেন আমাদের সাহায্য করবেন। যদিও সে সাহায্যটুকু নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আপনাদের ওপব। শুধু আমাদের অনুরোধ আপনাবা চিন্তা করুন, ভেবে দেখুন, স্বাধীনতার সূর্য দেখার ইচ্ছা আপনাদের মনের মধ্যেও সুপ্ত আছে কীনা। মুক্তির আলো আপনারাও কামনা করেন কীনা।

মানুষ এগিয়ে এল সাহায্যে। মুক্তি যোদ্ধাদের আহ্বানে সাড়া দিল।

নির্লজ্জ বর্বর আক্রমণকারী দেশ, সমাজ, জাতি ও মানুষের শত্রু ফরাসী পশুদের প্রতি ভিয়েৎমিন মুক্তি যোদ্ধারা তাদের চোরা গোপ্তা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে চলল দিনের পর দিন।

ফরাসীদের সাধ্য হল না তাদের ধরে, শাস্তি দেয়। পরিবর্তে মানুষের প্রতি অত্যাচার বেড়ে চলল দিন দিন। মুক্তি যোদ্ধাদের জন্যে শাস্তি পেতে লাগলো ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ।

ফরাসীদের অত্যাচার তো নতুন নয়। দিনের পর দিন তারা অত্যাচার করেছে। কত শত সুখের সংসারকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে। কত মেয়ের কুমারী বুকের স্বপ্নকে ওরা ওদের লালসার আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। কত মায়ের বুকের সন্তান, স্বামীকে ওরা হত্যা করেছে জহ্লাদের উল্লাসে।

সেদিন অসহায় ছিল ওরা। বাধ্য হয়েছিল অত্যাচার সহ্য করতে। ব্যর্থ কান্নায় ভরিয়ে দিয়েছিল বুক। প্রাণের আগুন মাথা খুঁড়ে মরেছিল পথ না পেয়ে।

আজ দিন বদলের পালা এসেছে। ফরাসীদের অত্যাচার আজ আর একতরফা নয়। সে অত্যাচারের শাস্তি ওরাও পাচ্ছে। ওদের বুকেও আঘাত হানছে দেশের ছেলেরা। তারা ভয়কে জয় করেছে। দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। তারা আজ ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, অনেকদিন

আমরা মার খেয়েছি। তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা করে গেছো। আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি সব। যাঁরা সামান্য প্রতিবাদ করেছেন, তাঁদেরও তোমরা রেহাই দাও নি। কিন্তু আর নয়। আমাদের তোমরা মেরে রাখতে চেয়েছিলে। মেরে মেরে শেষ করতে চেয়েছিল। আমরা মরিনি। আমরা জেগে উঠেছি। তোমাদের অপরাধের, বর্বরতার শাস্তি আমরা দেবই।

মৃত্যু অথবা মুক্তি!

ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের!

আমরা আমাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু যতক্ষণ না নিঃশেষ হয় ততক্ষণ দেশের জন্যে যুদ্ধ করবো।

মরবো তবু দাসত্বকে মেনে নেব না।

কারা?

ওরা কারা?

কী ওদের পরিচয়? কেন ওরা মরতে চায়? কাদের জন্যে করছে জীবন পণ?

আমাদের জন্যে। ভিয়েৎনামের মানুষের জন্যে। দেশের জন্যে। ওরা আমাদেরই একজন। কারো স্বামী, কারো বা সন্তান। আমাদের রক্তধারাই বইছে ওদের শরীরে। ওরা দেশের সন্তান। পিতৃভূমির স্বাধীনতা ওদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ওদের একমাত্র স্বপ্ন।

ওরা মুক্তি চায়।

পিতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে ওরা জীবন করেছে উৎসর্গ।

আমরা আছি। তোমাদের পাশে আছি। হে বীর সৈনিকের দল, তোমাদের যাত্রা পথে আমরা রইলাম। দেশের স্বাধীনতা যে আমাদেরও কাম্য। দাসত্বের শৃঙ্খল যে আমরাও ছিঁড়তে চাই।

আর তিনি? সেই মানুষটি?

যিনি একদিন দীর্ঘ তিরিশ বছর আগে পিতৃভূমি উদ্ধারের স্বপ্ন বুকে নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। শুরু হয়েছিল পথ খোঁজা। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নদী পার হয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পায়ে ফিরে এসেছিলেন দেশের মাটিতে ; কিন্তু রইলেন না। আবার শুরু করলেন পথ চলা। পথের দিশা পেয়েছেন, পেয়েছেন মানিকের সন্ধান, কিন্তু সে মানিক তিনি আহরণ করে নিয়ে আসেন নি। কারণ তিনি জানতেন মানিকের সন্ধান যখন জানা রইলো, তখন কুড়িয়ে নেবেন একদিন। যদি প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজন নিশ্চই মেটাবেন।

সেই জন্যেই ১৯৪২ সালে জুলাই মাসে বেরিয়ে পড়েছেন আবার। কিন্তু এবার বন্ধু করল বিশ্বাসঘাতকতা। চিয়াং কাই শেক বন্দী করে রাখলেন তাঁকে।

এল মক্তি।

দীর্ঘ একবছর পবে জেলখানা থেকে মুক্তি পেলেন তিনি।

সান ইয়াৎ সেনের মন্ত্রশিষ্য চিয়াং কাই শেক মুক্তি দিলেন তাঁকে। শেষ হল বন্দী জীবনেব দুঃসহ যন্ত্রণাব দিনগুলো। যে দিন গুলোতে তিনি

বরং মৃত্যু ভাল দাসত্বেব চেয়ে। আমার স্বদেশের ঘরে ঘরে
লালে লাল পতাকারা আবার উর্দ্ধে উড়িছে!

যে পতাকার স্বপ্নকে সার্থক করতে এত দূর ছুটে এসেছেন, সেই পতাকার স্বপ্ন যাতে বিফল না হয় তাব জন্যে নিজের কথা তিনি একবারও ভাবলেন না। দাসত্বের এক শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্নকে স্বার্থক করার পথ খুঁজতে এসে আর এক শৃঙ্খলের বাঁধনে নিজেকে জড়াতে বাধ্য হলেন তিনি। বরং মৃত্যু ভাল দাসত্বের চেয়ে, সেই দাসত্বকেই মেনে নিলেন তিনি। শয়তান চিয়াং কাই শেকের বিশ্বাস ঘাতকদের নামের তালিকার ওপরে নিজের নামটি লিখলেন।

লিখলেন নিজের হাতে। হাত কাঁপল না। ফিরে চাইলেন না অন্য কোন দিকে।

প্রয়োজন অর্থ। তিনি অর্থের জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দিলেন।

তাই কী? না। সাক্ষ্য তার ইতিহাস। ভিয়েৎনামের রক্ত ঝরা দিনগুলো। বৃহত্তর স্বার্থের কাছে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থটুকুকে বিলিয়ে দিলেন হাসি মুখে। কারণ নিজের জন্যে তিনি তো কিছু করেন নি। কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দেননি। তাঁর জীবনেব একমাত্র ধ্যান-ধারণা স্বপ্ন পিতৃভূমির বন্ধন মুক্তি। তিনি চান ভিয়েৎনামেব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতাব জন্যে তিনি তাঁর বুকেব রক্ত হাসি মুখে ঢেলে দিতে পারেন, সামান্য বদনামে কিছু যায় আসে না।

ভিয়েৎনাম বিপ্লবী লীগেব মধ্যমণি হলেন তিনি। তাঁরা বিপ্লব করবেন সেদিন, যেদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবে, চিয়াং কাই শেক হবেন ভিয়েৎনামের প্রভু—ভিয়েৎনাম বিপ্লবী লীগ সেদিন নিজেদের দেশকে চীনের হাতে তুলে দেবে নির্দ্বিধায়। আর সেদিনের জন্যেই এই প্রস্তুতি, বিপুল অর্থব্যায়।

চিয়াং কাই শেক বিনা দ্বিধায় অর্থ তুলে দেন বন্ধুর হাতে। হো চি মিন সেই অর্থ গোপন পথে পাঠিয়ে দেন গিয়াপেব কাছে। সেই অর্থে চলে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি।

কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন একদিন। ধরলেন নগুয়েন হাই থান। অতীতের মানুষের শ্রদ্ধার ভালবাসার জাতীয়তাবাদী নেতা! বৃদ্ধ চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হল না তাঁব পক্ষে। অভিযোগ উঠল তাঁর নামে। তিনি মহামান্য চিয়াং কাই শেকের অর্থ ভিয়েৎনামের মুক্তি যোদ্ধাদের পেছনে জলের মত ব্যয় কবছেন। একটুও কাজ এগুচ্ছে না ভিয়েৎনামে শয়তানদের দল তৈরীতে।

বিচাব সভা বসলো লিউ চাওতে। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে।

জাতীয়তাবাদী নেতার দল এগিয়ে এল সরবে। চিয়াং কাই শেকের হাতে দেখতে চাইল হো চি মিনের বিচার।

সে বিচার সভায় এগিয়ে এল আমেরিকা। মিটিয়ে দিল বিরোধ। শক্ত করলো হো চি মিনের হাত। প্রতিশ্রুতি দিল অস্ত্র রসদের, মুক্তি যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষ তারা দেবে।

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে আবার তিনি ফিরে এলেন দেশের মাটিতে।

তারপর!

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে তৈরী হল 'আর্মড ব্রিগেড ফর দি লিবারেশন অব ভিয়েটনাম'। ভিয়েৎনামের প্রথম মুক্তি ফৌজ। গেরিলাবাহিনী সেই প্রথম একটি সংগঠিত রূপ পেল।

বৃহত্তর প্রস্তুতিতে মন দিলেন তিনি। চোরা গোপ্তা আক্রমণ নয়, এবার অভিযান চালাতে হবে। ভিয়েৎনামেব বুক থেকে দূর করতে হবে হানাদাব দস্যুদের।

আয়োজন সামান্য। অস্ত্র সংখ্যা তুচ্ছ। কিন্তু এই নিয়েই অসাধ্য সাধন করলেন ভো নগুয়েন গিয়াপ। ভিয়েৎমিন মুক্তি যোদ্ধাব দল উত্তর টংকিনের পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলো।

ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ এগিয়ে এল তাদের সাহায্যে। মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে গেল তারা। নিজেদের ঘরে নিঃসংশয়ে আশ্রয় দিল তাদের। দিল তৃষ্ণাব জল, ক্ষুধার আহাব, রাতের আশ্রয়। পৌঁছে দিল শত্রুর খবরাখবব। বিপদেব সংকেত জানিয়ে দিল তারাই।

ফলে ফরাসী সৈন্যদল তাদের ওপর চালাতে লাগল চরম অত্যাচার। একজন ফবাসী সৈন্যেব মৃত্যুব জন্যে নির্বিচারে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করছে তারা।

সমস্ত অত্যাচাব মুখ বুজে সহ্য করছে মানুষ। কারণ তারা জানে, তাদের প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিফল ওই বর্বর অত্যাচারীদের পেতেই হবে। মুক্তি যোদ্ধারা ওদের ক্ষমা করবে না।

না, ক্ষমা কবেনি মুক্তি যোদ্ধাবা। দৃঢ় পদক্ষেপে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে তারা। তাদের সেই দুর্বার গতি রুদ্ধ করার কোন ক্ষমতাই ওদের হয়নি।

লক্ষ্যে পৌঁছেছে ওরা। এসেছে দেশের মুক্তি-লগ্ন। মুক্ত আকাশের নিচে ভিয়েৎনামের মানুষ বহুদিন পরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়েছে। জয়ধ্বনীতে মুখর হয়ে উঠেছে ভিয়েৎনামের আকাশ বাতাশ।

ওরা পালিয়ে বেঁচেছে!

১৯৪৫ সালেব ২রা সেপ্টেম্বব।

জাতীর জীবনে এল মহালগ্ন। মুক্ত হল একটা দেশ। আপন অধিকার তারা কেড়ে নিল বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে। দীপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানালেন তিনি দেশের প্রতিটি নরনারীর কাছে।

এই যে স্বাধীনতা, ভিয়েৎনামের মুক্তি সহজ স্বাভাবিক পথে আসেনি। এল সংগ্রামে, বুকেব রক্তের বিনিময়ে।

৬ই আগষ্ট হিবোসিমায় আণবিক বোমা ফেলল আমেরিকা। জাপানের মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিল তাবা। জাপানের জীবনে এঁকে দিল চিবস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন, সেই ক্ষত আজও দূব হয়নি তার। একটা জাতি চিরদিনের মত পঙ্গু অথর্ব হয়ে পড়লো।

১৫ই আগষ্ট মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল জাপান। আত্মসমর্পণ না করেও তার কোন পথ ছিল না। কিন্তু ভিয়েৎনাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ফরাসীদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে সে গেল না। ভিয়েৎনামকে তুলে দিয়ে গেল তারা সম্রাট বাও দাই-এর হাতে।

অপদার্থ বাও দাই। সমাজের শত্রু, জাতির শত্রু। আপন স্বার্থের জন্যে সব পারে সে। ভিয়েৎনামকে বিকিয়ে দিতে পারে সে যে কোন মুহূর্তে।

তাই গিয়াপের নির্দেশে মুক্তি যোদ্ধার দল পাবত্য এলাকা ত্যাগ

ক্রমে নেমে এল নগরের পথে। ১৭ই আগষ্ট হ্যানয় অধিকার করল তারা।

২০শে আগষ্ট ভিয়েৎনাম মুক্তি কমিটির আহ্বানে সমস্ত ভিয়েৎনাম জুড়ে হল গণ অভ্যুত্থান। ফরাসীরা সেই প্রথম নিরস্ত্র মানুষের হাতে মার খেল। তাদের হাতের রাইফেল হাতেই রয়ে গেল। সে রাইফেল তোলবার সাহস তাদের হল না। তারা বুঝতে পারল এ তাদের দিন বদলের পালা। মার তাদের খেতেই হবে।

মার তারা খেল। মার খেল মুখ বুজে। সহ্য করলো জনতাব রোষ-বহ্নি। তাদের তে-রঙা পতাকা ধূলায় লুটোপুটি খেতে লাগলো। তারা তাদের জাতীয় পতাকার অবমাননায় একবারও প্রতিবাদ ধ্বনী উচ্চারণ করতে পারল না। বলল না, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর প্রতীক আমাদের জাতীয় পতাকাকে অপমান তোমরা করো না।

কারণ, যে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর প্রতীক তাদের জাতীয় পতাকা, সেই স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রীকে তারা নিজেরাই পদদলিত করেছে। তারা প্রমাণ করেছে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীতে তারা বিশ্বাসী নয়। তারা দস্যু, বর্বর, রক্তের ক্ষুধা, মাটির ক্ষুধা তাদের মনে। তারা মুখোস আঁটা জানোয়ার। তারা বর্বর, পশু।

সেই পশুত্বের পরিচয় আবার তারা দিল। নতুন প্রাণস্পন্দনে যেদিন আবার জেগে উঠল ভিয়েৎনাম, আকাশে উঠল স্বাধীনতাব সূর্য, সেই নতুন দিনের নতুন সূর্যকে অভিবাদন না জানিয়ে, পট্‌স্ ডাম বৈঠকের নির্দেশকে উপেক্ষা করে বৃটিশের সহযোগিতায় সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্তিপ্রিয় মানুষদের ওপর চালালো নির্লজ্জ আক্রমণ। রক্তে ভেসে গেল বা দিন স্কোয়ারের পথ। বৃটিশ আর ফরাসী চক্রান্তকারীরা একযোগে শুরু করলো দমন নীতি।

ভিয়েৎনামের মানুষের মনে আবার জমে উঠতে লাগল হতাশার অন্ধকার। কেড়ে নেওয়া হল মানবিক অধিকার। মিলেটারীর

বুটের নিচে ভিয়েৎনামকে দমিয়ে 'রাখার চক্রান্ত শুরু হল আবার। হো চি মিনের সরকারকে বেআইনী ঘোষণা করা হল। নির্বিচারে হত্যা করা হল মানুষকে।

শুধু বৃটিশ, ফরাসী নয় যোগ দিল একদিন জাপানও।

ভিয়েৎনামীদের জীবনে আবার শুরু হল স্বাধীনতার যুদ্ধ। লাল জমির ওপর হলুদ তারা, ভিয়েৎনামের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে আবার আকাশে উড়ল স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর প্রতীক ফরাসীদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা।

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে।

সুদীর্ঘ দিন মাস বছরের হিসাব। রক্ত ঝরা এক একটা দিন। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নময় রাত্রি। বন্ধু নেই। একা ভিয়েৎনাম এগিয়েছে তার পথে। মৃত্যুকে হেলায় করেছে জয়।

১৯৫৪ সালের ৭ই মে। দিয়েন বিয়েন ফু-তে যুদ্ধ আরম্ভের পঞ্চান্ন দিন পরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি শেষ মার খেল মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো তারা। শেষ হল তাদের ক্ষমতার দম্ভ, সভ্য জগতের অহঙ্কার। দিয়েন বিয়েন ফু-র চিতাশয্যায় শেষ শয়নে শায়িত হল একটা জাতি। পরাজয়ের কালিমা লিপ্ত মুখে মাথা নত করে ভিয়েৎনামের মাটি থেকে চলে এল তারা। ব্যস্ত হল ক্ষতের চিকিৎসায়।

অথচ তাদের কাছে আবেদন নিবেদন কম জানাননি তিনি। তাঁর কাজে গর্জে উঠেছে মানুষ। বলেছে, দেশের শত্রু, জাতির শত্রুর সঙ্গে কোন আপোষ নয়। আমরা যুদ্ধ করবো, প্রাণ দেব। বাহু বলে ছিনিয়ে নেব আমাদের অধিকার।

যুদ্ধ পশুশক্তির প্রকাশ।

যুদ্ধ হিংসা বাড়ায়।

যুদ্ধ, মানুষের মনুষত্ব কেড়ে নেয়।

যুদ্ধকে ঘৃণা করেন তিনি। রক্তপাত তাঁর কাম্য নয়। তিনি চান শান্তি। তিনি চান, মানুষ-মানুষকে ভালবাসুক, শ্রদ্ধা করুক, প্রেমের অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত হোক মানুষের অন্তরে। মনুষত্বের অধিকারী হয়ে উঠুক মানুষ তার কর্মে।

হো চি মিন!

তিনি শান্তি চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। ভিয়েৎ-নামীদের বাঁচার অধিকার। ত্যাগ স্বীকার করেও তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন অতীতকে। অতীতের তিক্ততা।

সেই জন্যেই ১৯৪৬ সালে সাঁতে নির প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন। ভিয়েৎনামের ওপর ফরাসীদের প্রভুত্বের দাবীকে মেনে নিলেন। হীনতা স্বীকার করে নিলেন তিনি। কারণ তখন তিনি মানুষের মনুষত্ব বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে। তিনি বিশ্বাস করেন পরস্পরের সহযোগিতায় দুরূহ সমস্যা মিটে যাওয়া সম্ভব। শান্তির পথে, আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা লাভ করবেন তিনি।

গর্জে উঠল শত সহস্র কণ্ঠ, না, কখনো না!

আমরা ওদের সঙ্গে কোন আলোচনা করব না। স্বাধীনতা ভিক্ষে করে আমরা পেতে চাই না।

আমরা প্রাণ দেব, মরবো তবু কোন আপোষ নীতি মানবো না।

না নয় হ্যাঁ!

গর্জে উঠল তাঁর কণ্ঠ। লক্ষ কণ্ঠের গর্জনকে নিশ্চুপ করেছিলেন তিনি। তাঁর হ্যাঁ-কে না করার সাহস কারো হল না। একজন রুগ্ন বৃদ্ধকে, তাঁর কঠিন আদেশকে অমান্য করতে পারল না কেউ।

বললেন, শুধু লড়াই করলে, মরলে দেশ স্বাধীন করা যায় না। সাঁতে নির সঙ্গে আমার চুক্তি হয়তো অনেকের কাছেই অসম্মানজনক

মনে হবে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকে আমি চির তরে বিকিয়ে দিইনি। দেশের, আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বে আমার যেন মৃত্যু হয়। আমি শপথ করে বলছি কোন দিন আমি আপনাদের বিপথে চালনা করিনি, কোনদিন তা যেন আমাকে করতে না হয়।

বিরুদ্ধবাদীর দল মাথা নত করলো। ক্ষমা চাইলো তারা।

বলল, হো চি মিন আমরা তোমাকে জানি, বিশ্বাস করি। তুমি আমাদের ক্ষমা কোর।

ক্ষমা ? কিসের ক্ষমা ? ভুল মানুষেই করে, সংশোধনও।

তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটেনি তাতেই তিনি ভুলে গেলেন সব অপমান। দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমরা জয়যুক্ত হবই !

শত সহস্র কণ্ঠ গর্জে উঠল, ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ।

হো চি মিন জিন্দাবাদ !

আবার সেই ফ্রান্স। অতীতের ফ্রান্সের বুকে আবার পা দিলেন। একদিন এসেছিল প্রথম বা. বা হয়েছিলেন নগুয়েন আই কুয়োক। ১৯৪৬ সালের মে মাসে এলেন হো চি মিন। জাগ্রত ভিয়েৎনামের প্রাণ পুরুষ।

সেদিন সঙ্গী কেউ ছিল না। এসেছিলেন পথের সন্ধানে। পেয়েছিলেন পথ। মুক্তিপথের সন্ধান। লেনিন তাঁর মনের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন।

আজ সঙ্গে ফাম ভান ডং আর ভো নগুয়েন গিয়াপ। আজও এসেছেন পথের সন্ধানে। সে পথ শান্তির, সৌহার্দ্রের। আজ তিনি শান্তির প্রয়াসী।

কিন্তু শান্তি পথের পথিককে কেউ আহ্বান জানালো না। বলল

না, এসো বসো। আমরা তোমার কথা শুনবো, আলোচনা করবো, তোমার দাবীকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

কেউ নয়। একজনও এগিয়ে এলনা। আহ্বান জানাল না। ফ্রান্স তার আপন দম্ভে মুখ ঘুরিয়ে রইলো। ছোট্ট দেশের ছোট্ট মানুষটার প্রতি ফিরে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করলো না।

কিন্তু তিনি চান শান্তি। অতীতকে ভুলে ফরাসীদের সঙ্গে মিলে যেতে চান। ফ্রান্সকে মহত্বদানে তাঁর এতটুকু আপত্তি নেই। তিনি চান শুধু ভিয়েৎনামে মানুষের প্রতি অত্যাচারের শেষ হোক।

তিনটি মাস দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালেন তিনি। শান্তির ঝুলি কাঁধে নিয়ে কাকুতি মিনতি করলেন জনে জনে।

শেষে দীর্ঘদিনের আবেদন নিবেদনে কাজ হল। ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মেবিয়ান মুটেটে চক্ষুলজ্জার খাতিরে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। কারণ তিনি তাঁর পরিচিত। দীর্ঘদিন আগে একটু বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে। সেদিনের ফ্রান্সের অজ্ঞাত এক যুবক আইনজীবির সঙ্গে এক রাজনীতিকের পরিচয় ঘটেছিল। আকর্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা পরস্পরের প্রতি।

মেরিয়ান মুটেটের চেষ্টায় সেপ্টেম্বরেব মাঝামাঝি এক চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হল। ৬ই মার্চের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভিয়েৎনামের স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকারকে আর একবার লিখিতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল।

দেশে ফিরে এলেন তিনি।

কিন্তু কিছুই পেলনা ভিয়েৎনাম। তার প্রতি অন্যায় অত্যাচারের শেষ হল না। ফ্রান্সেব কম্যুনিষ্ট পার্টি পর্যন্ত ভিয়েৎনামের স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকারকে মেনে নিলনা।

তবু তিনি দেশের মানুষকে শান্ত থাকতে বললেন। মুক্তি যোদ্ধাদের সংযত থাকার নির্দেশ দিলেন। বললেন, ওরা

আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছে। শান্তিরক্ষা করা ওদের কর্তব্য।

কর্তব্য!

কর্তব্য মানে না সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল। তাদের লোভ লালসাকে সংযত করার শিক্ষা তারা লাভ করেনি। তারা শুধুমাত্র শিখেছে অত্যাচার করতে। মানুষের ঘর জ্বালাতে, সাজানো সংসার ছারখার করতে, মানুষের বুকের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে, নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

তবু তিনি অসীম ধৈর্য্যে কঠিন আদেশে দেশবাসীকে সংযত থাকতে বললেন, কিন্তু একদিন তাঁর নিজেরও সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের পৈশাচিকতা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল।

সেদিন। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে দেশবাসীকে আবার আহ্বান জানালেন। বললেন, আর নয়, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। আমরা শান্তি চেয়েও পাইনি। ওরা শান্তি চায় না। রক্তের নেশা ওদের মাতাল করেছে। ওদের অন্যায় রক্ততৃষ্ণাকে এবার দূর করতে হবে আমাদের। ওরা যুদ্ধ চায়। আমরা ওদের যুদ্ধই দেব।

ভিয়েৎনামের মানুষ, তোমরা জাগো, অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও। ওদের বুঝিয়ে দাও বর্বরতার স্থান ভিয়েৎনামের মাটিতে হবে না। পিতৃভূমি ভিয়েৎনামকে মুক্ত আমরা করবোই।

মৃত্যু অথবা মুক্তি!

ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের।

১৯৪৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর ফরাসীদের সঙ্গে ভিয়েৎনামীদের শুরু হল সংগ্রাম। ঘরের শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতায় হ্যানয় চলে গেল আবার ফরাসীদের হাতে। ভিয়েৎনামী মুক্তি যোদ্ধার দল আবার

ফিরে গেল গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে। হারিয়ে গেল তারা। হারিয়ে গেলেন তিনি। হো চি মিন।

না হারিয়ে তিনি যাননি। তার প্রমাণ পাওয়া গেল তিন বছর পরে। তিন বছরেব কঠিন জীবন-যাত্রা পালনের পর ভিয়েৎনামের মানুষেব সঙ্গে অগ্নিখুব্ধ মুক্তি যোদ্ধার দল আবাব দেখা দিল। ফবাসী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাবা আছে। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই ফারাসীদের।

নিস্তাব নেই আব একজনের। সম্রাট বাও দাই। যিনি ১৯৪৫, সালের ২?শে অাগষ্ট আন্নামের সিংহাসন থেকে নেমে হো চি মিনের সাধারণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছিলেন। নিযুক্ত হয়েছিলেন জাতীয় সবকারের উপদেষ্টারূপে। তারপব একদিন গিয়েছিলেন চীনে। সেখান থেকে হংকং। ১৯৪৯,এ। অনিচ্ছা সত্বেও দেশে ফিরলেন তিনি। ফরাসী দস্যুব দল আবাব শুরু কবলো তাঁকে নিয়ে পুতুল খেলা। তাঁব উগ্র যৌবনেব লালসা ছারখাব করতে লাগলো শান্তিব নীড়। নারী মাংস লোভী সম্রাট বাও দাই কলঙ্ক লেপন কবতে লাগলেন জাতির জীবনে।

জয়, জয় আর জয়।

একের পর এক। ' সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গের মত। সে স্রোতকে বাধা দেওয়া সম্ভব হল না ফরাসী শক্তির।

১৯৫০, সালে মাও সে তুং যখন সমর্থন জানালেন ভিয়েৎনামী সরকাবকে, টংকিন সীমান্তে মোতায়েন কবলেন সৈন্য, দিলেন সাহায্য তখন সে স্রোত যেন দুর্বার হয়ে উঠল।

এগিয়ে এল রাশিয়া, এগিয়ে এলো আবো অনেক দেশ।

আর ঠিক এমনি সময় ক্ষত বিক্ষত ফ্রান্স সাহায্যের আবেদন জানালো আমেরিকার কাছে। কারণ ক্ষুদ্র দেশটার মানুষগুলোকে

শেষ করতে গিয়ে সে দেউলে হয়ে গেছে। নাপামের আগুন এতটুকু ক্ষতি করতে পারেনি ভিয়েৎনামের। মানুষ মরেছে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার ঘর বাড়ি শষ্য-সম্ভার, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সে, হয়তো বা তার প্রাণটা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা থেকে এতটুকু টলেনি তার মন।

মেসিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে বুক তবু সেই ঝাঝরা বুক নিয়েই যতক্ষণ পেরেছে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে বীর।

তার প্রাণের আগুন জ্বলেছে সমানে। সে আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি অত্যাচারে, হত্যায়, মাঝে দেউলিয়ার খাতায় খাতায় নাম লিখিয়েছে ফ্রান্স।

আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো ফ্রান্স। এগিয়ে এল আমেরিকা। আমেরিকার মহান প্রেসিডেণ্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান এগিয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। হ্যারি বললেন, এ আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য--কম্যুনিজম প্রতিরোধ না করতে পারলে দুনিয়ায় শান্তি আসবে না।

শান্তি রক্ষকের মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হল আমেরিকা। মানব প্রেমের বাণী প্রচার করলো ছোট্ট দেশটার শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে মারার জন্যে অস্ত্র পাঠিয়ে।

অথচ এই আমেরিকাই একদিন ভিয়েৎনামের হাত শক্ত করেছিল। সাহায্য দিয়েছিল হো চি মিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সার্থক করতে। স্বীকৃতি দিয়েছিল হো'র সরকারকে।

সেই আমেরিকারই স্বরূপ পরিবর্তন হল। সে নগ্ন ভাবে জানিয়ে দিল তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। সে বাঁচতে চায়। বাঁচতে হলে যুদ্ধ তার একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধ না হলে আমেরিকা বাঁচবে না। শেষ হয়ে যাবে একটা জাতি। রক্তের নদী বইবে অসন্তোষের

আগুনে দগ্ধ মানুষগুলোর হিংসার প্রকাশে। ওয়াশিংটনের পথে দায় হবে হাঁটা।

ফরাসীদের আবেদনে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো আমেরিকা। জড়িয়ে পড়লো বললে হয়তো ভুল বলা হয়, নিজেকে সে ইচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে নিল। অর্থ অস্ত্র যখন যা চাইলো ফ্রান্স, তাই দিল। না চাইতেও পৌঁছে গেল অনেক কিছু।- সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে বৈকী।

কিন্তু ভিয়েৎনামের আগুন তাতে নিভল না। প্রাণের আগুন কী অস্ত্রের আঘাতে নেভে? নেভে না। নেভাতে পারল না ওরা। শেষে একদিন পুড়ে মরলো। ভিয়েৎনামের বুক থেকে মুছে গেল ফরাসীদের নাম।

সব খুইয়ে দেশে ফিরে গেল ওরা।

যেতে বাধ্য হল।

ভিয়েৎনামের আকাশে আবার উঠলো মুক্তির পতাকা। হাওয়ায় উড়লো পত্‌পত্‌ করে। লাল জমির ওপর হলুদ তারা।

সে দিনটা ৭ই মে ১৯৫৪ সাল।

দিয়েন বিয়েন ফু-তে রচিত হল ফরাসীদের শেষ শয্যা।

আশি বছরের ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শেষ দিন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ নেই। একজন যায় আর একজন আসে।

ফরাসীরা গেল, এল আমেরিকা।

ভিয়েৎনামের মাটিতে বাঁচতে এল তারা। একটা জাতি বাঁ[illegible] জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো রক্ত সমুদ্রে। তারা একবারও ভাবল না, চি[illegible] করার প্রয়োজন অনুভব করলো না যে, হিংসার আশ্রয়ে বেঁচে ওঠা সম্ভব নয়। কিছুদিনের জন্যে হয়তো তাকে বাঁচা বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা বাঁচা নয়, তার নাম মৃত্যু।

১৯৫৪ সালের ৭ই মে ভিয়েৎনামের মাটিতে মৃত্যু ঘটলো ফরাসীদের। আর ৮ই মে জেনিভায় শুরু হল জেনিভার আন্তর্জাতিক অধিবেশন। অধিবেশনের বৈঠকে যোগ দিল ফ্রান্স, ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, বৃটেন, বাও দাই-এর পুতুল সরকার, কম্বোডিয়া আর লাওস।

একমাত্র আমেরিকা ছাড়া সবাই চাইল মীমাংসা। মনে যাই থাক জেনিভার আন্তর্জাতিক অধিবেশন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে তার চেষ্টা করল। কিন্তু আমেরিকা ছিঁড়ে ফেলল তার মুখে আঁটা ভদ্রতার মুখোশটুকু। বিরোধিতা করল সে। তার একমাত্র যুক্তি ভীয়েৎনামীদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে কম্যুনিষ্টদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কম্যুনিষ্টদের তারা কোনদিনই সমর্থন জানাবে না।

অথচ এই আমেরিকাই একদিন ১৯৪৬ সালের ভিয়েৎমিনদের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়েছিল। শক্ত করে ছিল হো চি মিনের হাত।

অস্ত্র রসদ যুগিয়েছিল গোপনে। সেদিন তার কাছে ভিয়েৎনামীদের সেই বাঁচার লড়াই কম্যুনিষ্ট আন্দোলন আখ্যা পায়নি। হো চি মিন তাদের চোখে ছিলেন মহান জাতীয় নেতা।

কিন্তু ভুলে গেল তারা সেদিন। মুছে ফেলল অতীত স্মৃতি। কারণ মনে তাদেৎ রক্তের নেশা। আমেরিকার নাভিশ্বাস উঠেছে, আমেরিকা ধ্বংসেব পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আইসেন হাওয়ার চান তাই যুদ্ধ। ভিয়েৎনামে শান্তি নয় যুদ্ধ চলুক। ভিয়েৎনামীদের বুকেব রক্তের বিনিময়ে বেঁচে উঠুক একটা জাতি

আমেরিকা বাঁচতে চায়।

সেই বাঁচাব জন্যে সব বিছু করতে তারা প্রস্তুত। সব কিছু।

তবু, তাদের বিরোধিতা সত্বেও জেনিভা সম্মেলনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। যদিও কোন শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করলো না আমেরিকা। তার একমাত্র কথা কম্যুনিষ্টদের সে সমর্থন জানাবে না।

সেদিন, সেই ২০শে জুলাই ১৯৫৪ সালে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষবিত হল তাতে ভিয়েৎনাম আর একবার প্রমাণ করলো তারা শান্তি চায়। মেনে নিল দেশ ভাগ। কারণ গণতন্ত্রকে তাবা শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, শ্রদ্ধাও করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিলনের কথা যখন বলা হল, তাদেব মেনে নিল তারা।

অথচ তিনি, হো চি মিন, যদি মনে করতেন এই ভাগাভাগি তিনি মেনে নেবেন না, বিজয়ী তারা, একমাত্র অধিকার তাদের, তখন তাঁকে বাধা দেয় এমন কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু শান্তি চেয়েছেন তিনি। শান্তির পথকে আঁকড়ে ধরেছেন বার বার। আঘাত পেয়েছেন, ঠকেছেন, তবু শান্তির পথ পরিত্যাগ করতে মন চায়নি। আব তিনি বার বার শান্তি চেয়েছেন বলেই, হয়েছেন কম্যুনিষ্ট। গণতন্ত্রের জীবন বেঁধে বিশ্বাসী তিনি গণতন্ত্রের মুখোসধারীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

তবু ওদের লজ্জা হয়নি।

গণতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করতে একবারও বাধেনি।

দুনিয়ার ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েও ওরা বলেছে আমরা শান্তিকামী। শান্তি আমাদের জীবনমন্ত্র। যুদ্ধের বিভীষিকার মাঝে শান্তিকে করেছে ব্যাঙ্গ।

সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর যে ভিয়েৎনাম সাময়িক ভাবে বিভক্ত হয়েছিল, দুটি বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে যারা আবার মিলনের স্বপ্ন দেখেছিল, একজাতি একপ্রাণ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল আপন অধিকারের মাঝে, তাদের সেই প্রতীক্ষা, মিলনের স্বপ্ন ওরা ওদের রক্তাক্ত থাবায় তছনছ করে দিল। চুক্তি লঙ্ঘন করে ১৯৫৫ সালে পালিয়ে গেল ফরাসীরা। এল আমেরিকা। নতুন রূপে অবতীর্ণ হল তারা ভিয়েৎনামের মাটিতে। কাক তাড়ুয়ার ছদ্মবেশে আমেরিকা এসে হাত ধরল সম্রাট বাও দাই-এর। তারপর একদিন এল নো দিন জিয়েম।

আমেরিকা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল শান্তির পথে।

শান্তি, বিশ্বাস!

শান্তি চেয়েছেন হো চি মিন। শান্তি চেয়েছে ভিয়েৎনামের মানুষ। অশান্তিকে তারা মনে প্রাণে ঘৃণা করে। তারা শান্তি চায়, চায় বাঁচাব অধিকার। তারা বাঁচতে চায়।

বিশ্বাস করেছেন তিনি পশ্চিমী শক্তিকে। সেই বিশ্বাসের পরিবর্তে পেয়েছেন আঘাত, লাভ করেছেন অপমান। একটা মানুষেব নামে নিন্দা ছড়িয়েছে আমেরিকা। আর তিনি সে নিন্দাটুকু হাসি মুখে মাথায় তুলে নিয়েছেন। দেশের মানুষকে বলেছেন, ওদের নিন্দা তো নিন্দা নয়, প্রসংশা। আমি তোমাদের লোক। আমি তোমাদের সেবক, আমার নিন্দা প্রসংশার একমাত্র অধিকার তোমাদেরই আছে। আমার বিচারের অধিকারও তোমাদের।

বিচার ?

কার বিচার করবে মানুষ ? ভিয়েৎনামের মানুষ কার নিন্দা করবে ?

হো চি মিন !

তিনি তো মানুষ নন। তিনি প্রাণ। ভিয়েৎনামের প্রাণ শক্তি তিনি। সেই প্রাণ শক্তির অবমাননা তাদের মৃত্যুর নামান্তর। ভিয়েৎনামের মুক্তিব আকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল শুকতারা। আলো জেলেছেন তিনি, পথ দেখিয়েছেন তিনিই।

তিনি বললেন…

মেঘেরা জড়ায় গিরিচূড়াদের, গিরিচূড়া বাঁধে মেঘেদের,
নিচে ঐ নদী আয়নার মতো ঝিকি মিকি করে স্বচ্ছ।
পশ্চিম গিরি মৌলিতে ঘুবি, হৃদয় আমার চঞ্চল
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে, স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের।

আমি পারিনি। আমি ভুল করেছিলাম। আমি শান্তি চেয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম ওদের। ওদের শয়তানী আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। সে পথ অশান্তিব পথ। আজকের সভ্য দুনিয়ার মানুষের কাছে শান্তি যে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, মনুষ্যত্ব যে শেব হয়ে গেছে আমি তা জানতাম না।

তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো, আমার বিচার করো তোমরা। আমাকে শাস্তি দাও। তোমাদের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। বন্ধু, তোমরা আমাকে ক্ষমা কোর না। হো চি মিন অপরাধী, সভ্য দুনিয়ার মানুষদের বিশ্বাস করে সে অপরাধ করছে। তোমরা শাস্তি দাও।

বলো, তোমরা চুপ করে থেকো না। তোমাদের বিচারে কোন্ শাস্তি হো চি মিনের প্রাপ্য ?

না-না-না। গর্জে উঠল দক্ষিণ। দক্ষিণের মানুষ। ভিয়েৎনামেব মানুষ।

হো চি মিন! তুমি কোন অপরাধ করো নি। অপবাধ কবতে তুমি পার না।

মানুষের বিশ্বাস যদি মুছে যায়, মানুষ যদি শান্তি প্রয়াসী না হয় তাহলে তো সে মানুষ নয়, সে শয়তান, সে পশু।

আমবা দীর্ঘদিন পশু শক্তিব সঙ্গে লড়াই কবেছি। আবাব করবো। সংগ্রাম স্থগিত হয় মাত্র। আমবা আবাব সেই সংগ্রামকে গ্রহণ কবলাম। আমবা আবাব যুদ্ধ ক'বো। মুক্ত কববো আমাদেব অধিকাব।

হো চি মিন তুমি থাক। দূবে থাকলেও তুমি আছো, এইতো আমাদেব কাছে সত্য, একমাত্র সত্য। তুমি না হলে আমবা যে পথ ভুল কববো। খুজে পাবনা পথেব দিশা।

হো চি মিন, তোমাব নামই যে ভিয়েৎনামেব জাগবণেব মন্ত্র।

সেই মন্ত্রই যে আমাদেব প্রাণেব মন্ত্র। আমাদেব সব।

উত্তব নয়, দক্ষিণে।

নো দিন জিয়েমেব দাস সবকাব আমেবিকার ছত্রছায়ায় আনন্দে আত্মহাবা হয়ে উঠতে লাগল দিন দিন। আইন কানুন সং মিথ্যা। নো দিন জিয়েম যেখানে বর্তমান সেখানে আইনের কী প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নেই।

তবু আইন আছে। নো দিন জিয়েম মাঝে মধ্যে সে কথা বলে। স্বীকার কবে মানুষেব অধিকাব। মানুষই তো তাকে ভালবেসে দক্ষিণেব দেশে বসিয়েছে, ১৯৫৯ সালেব নির্বাচনে তাব সবকাবকে নির্দ্বিধায় সমর্থন জানিয়েছে। সমস্ত দায় দায়িত্ব তুলে দিয়েছে তাব হাতে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামেব মানুব এমনই জিয়েম-নির্ভর হয়েছে যে,

তাদের বিবাহে ও শেষ কৃত্যেও অনুমতি নেয়। জিয়েমের বিনা অনুমতিতে একপাও নড়ে না তারা। জিয়েমের নির্দেশিত পথেই তারা হাঁটে।

নো দিন জিয়েমের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অসাধ্য সাধিত হচ্ছে। জিয়েম তাদের স্বপ্ন সাধনা। জিয়েম তাদের জীবনের একমাত্র মানুষ। জিয়েম ভিয়েৎনামের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ।

অথচ এই জিয়েম যখন ভিয়েৎনামীদের জীবনে আসেনি তখন কেউ তাকে চিনতো না। জিয়েমের দিন কাটতো তখন অন্ধকারে। অন্ধকারের সাধনাতেই মগ্ন ছিল সে। আমেরিকার প্রাণপুরুষ, আমেরিকার দ্বিতীয় লিঙ্কন জন, এফ, কেনেডিই তাকে নিয়ে আসেন আলোয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষের জীবনের কর্ণধারে পরিণত করেন।

ধন্য কেনেডি, কৃতার্থ নো দিন জিয়েম।

জিয়েম মারফত কেনেডি এনে দিয়েছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের জীবনে পরম লগ্ন। মুক্তির অমৃতধারা।

সেই ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষের জীবন। ঘরের বন্ধন মুক্ত হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষ, সাধনার পথে এগিয়ে গেছে তারা। সিদ্ধিলাভ করেছে নো দিন জিয়েম।

এর সবটুকু কৃতিত্ব আমেরিকার। তবু তারা দাবী করেনি সে কৃতিত্বের কোন অংশ। কারণ তারা মহান। তাদের মহত্ত্বের দান অপরিশোধ্য।

তারা মানুষকে করেছে ঘর ছাড়া, জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে মানুষ কিন্তু রেহাই পায়নি তবুও। দক্ষিণের গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানের রূপ নিয়েছে। মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে বনাঞ্চল। চাষের ক্ষেত হয়েছে শস্য-শূন্য। উদ্ভিদের বংশে এসেছে মড়ক। কারণ চন্দ্র বিজয়ী

আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বুকে দিনের পর দিন চালিয়েছে তার বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা। তাদের জীবনে এসেছে সাফল্য।

কিন্তু ওরা কারা?

ওই ঘাসের জঙ্গলে বুকে হাঁটছে? মাটির মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ পথে পার হচ্ছে মাইলের পর মাইল? ওই যে নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলেছে কোন দুঃস্বপ্নের পথে। নো দিন জিয়মের সুখের রাজ্যপাটে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে?

ওরা কারা, কী ওদের পরিচয়।

মানুষ। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষ।

না-না মানুষ নয়। ওরা মানুষ নয়। ওরা কম্যুনিষ্ট। ওরা ভিয়েৎকং!

কিন্তু কেন ওরা ভিয়েৎকং হল? কেন মানুষের অধিকারে, সুখে শান্তিতে বাঁচতে পারল না, কেন?

১৯৫৪ সালে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সেই জেনিভা চুক্তিকে কারা পদদলিত করেছিল, কাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভিয়েৎনামের মানুষ শান্তিতে বাঁচতে পারল না, কাদের ষড়যন্ত্রে বাও দাই নামের একটা পুতুলকে সরিয়ে ১৯৫৫ সালে নো দিন জিয়েম নামের একটা অমানুষ জহ্লাদকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষের মাথার ওপর বসানো হয়েছিল? তারা কারা? কী তাদের পরিচয়?

পরিচয় তারা নিজেরাই দিয়েছে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ বেহায়ার মত বারবার তারা নিজেদের পরিচয় নিজেরাই ঘোষণা করেছে। তারা বলেছে, আমরা শান্তির দূত। পৃথিবীর মানুষের জীবনে আমরা শান্তির দূত। পৃথিবীর মানুষের জীবনে আমরা শান্তি বারি সিঞ্চন করে যাব। আমরা নিজেরা না খেয়েও অভুক্ত মানুষের মুখে আহার তুলে দেব। কারণ আমরা যে মহাত্যাগী।

খ্রীষ্টের জীবন সাধনাকে আমরা নিজেদের কর্মধারায় সার্থক করে তুলবো।

তাই করছে ওরা। ওরা ওদের নিজেদের ঘরে তরুণ ছেলেদের সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেছে। পরণে মারণাস্ত্রের বোঝা, হাতে মৃত্যু বাণ। চোখে লাগিয়ে দিচ্ছে কামনার কাজল। মনে এঁকে দিচ্ছে ভিয়েৎনামী মেয়েদের অনাঘ্রাত যৌবনের ছবি। অক্ষত যোনি কুমারী কন্যা। যে কন্যা শুদ্ধাচারে রক্ষা করছে যৌবন। যে কন্যা স্বপ্ন দেখছে সেদিনের। তার সাধনার কাল। মাতৃত্বের মহিমা যার বুকে।

সে কি! আনন্দে, বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠছে ওরা। অবিশ্বাস জাগছে মনে। না-না এ সম্ভব নয়। যৌবন তো ভোগের সামগ্রী। যৌবনকে উপভোগ করাই ধর্ম। সে ধর্মের মাঝে সংকীর্ণতা থাকা উচিৎ নয়।

পথে পথে ঘুরে বেড়ায় সারমেয় দল। বাধা বন্ধ হীন অবাধ গতি তাদের। প্রকৃতির নিয়মে আসে মিলন ঋতু। সে ঋতুকে তারা পশু হলেও অবাধে উপভোগ করে।

সেই অবাধ মিলনে তারাও তো অভ্যস্ত। নিত্য নতুন নতুন মিলন সঙ্গিনী নিয়ে যৌবনকে উপভোগ করে। মাতৃত্বের মহিমা অন্ধ কুসংস্কার। নারী প্রয়োজনে সন্তান উৎপাদন করবে, তার গৃহ জীবনে। যৌবনের অবাধ মিলন কেন ক্ষণিকের সুখ থেকে বঞ্চিত হবে?

মনে আগুন জ্বলে তাদের। কামনার আগুন। সেই আগুন ছড়িয়ে দেয় ভিয়েৎনামের বুকে।

পথের পাশে থামে ওদের গাড়ি। সামনে কুটীর। ভিয়েৎনামের শান্তির নীড়।

ওরা এগিয়ে যায়। ভয় পাওয়া বন্ধ দ্বার ভেঙ্গে ফেলে। কোন পুরুষ নেই। পালিয়ে গেছে বনে। ভিয়েৎকং হয়ে গেছে।

মা আর মেয়ে। কিশোরী কন্যা। না-না কৈশোর প্রাপ্তি এখনো

ঘটেনি। এখনো সে নিতান্ত বালিকা, অনভিজ্ঞা। পুতুল খেলার দিন এখনো সে পার হয়নি।

তাতে কী! অনাঘ্রাত। বালিকা হলেও নারী।

ওরা হুকুম দেয়, পোষাক খোল তোমরা।

চমকে ওঠে মা। বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে থাকে বালিকা।

পোষাক খোল তোমরা। আবার হুকুম করে ওদের কণ্ঠ।

মা নিরুপায়। কী করে সে সন্তানের সামনে তার দেহের আবরণ উন্মোচন করবে, কী করে নগ্ন করবে শরীর। কিন্তু পশুর দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ। মুক্তি নেই। ওরা রেহাই দেবে না তাদের।

জলে বুক ভাসে। কম্পিত হাতে প্রথমে মুক্ত করে কন্যার দেহ, তারপর নিজের পোষাকে হাত দেয়। বালিকার চোখে তখনও বিস্ময়। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না মায়ের চোখে জল কেন?

মায়ের হাত থেমে যায়। পারবে না, পারবে না সে সন্তানের সামনে নগ্ন হতে। কিন্তু তবুও পারতে হয়। ওরাই টেনে ছিঁড়ে ফেলে মায়ের পোষাক। দুটি নারী দেহ।

ওরা উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। তারপর···

মায়ের কানে আসে কন্যার আর্তনাদ। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে সে। তারপর আর কিছুই শুনতে পায়না।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসে মা-র। কষ্টে উঠে বসে। কন্যার দিকে চায়। রক্তের সমুদ্রে পড়ে আছে সে। এত রক্ত ছিল ওর দেহে, এমন লাল টকটকে!

কাছে আসে মা। বুকে টেনে নিতে যায়। চমকে ওঠে।

সে দেহ হীম হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা কনকনে।

ওরা মুক্তি দিয়ে গেছে বালিকা মেয়েটাকে!

১৯৬০ সাল।

নো দিন জিয়েমেব কারাগার পূর্ণ হয়ে উঠেছে মানুষের আগমনে। তৈরী হয়েছে আরো নতুন নতুন কারাগার। স্থান হয়নি। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষ নো দিন জিয়েমের সাধনা মন্দিরগুলো ভরিয়ে তুলতে লাগলো মুহূর্তে। শেষে নিরুপায় জিয়েম বাধ্য হয়েই সাধনায় সিদ্দিলাভ কবার আগেই মুক্তি দিতে লাগলো মানুষগুলোকে। তবু তারা এলো। আসতে লাগলো দলে দলে। নো দিন জিয়েমেব পুলিশ বাহিনী নিত্য তাদেব নিয়ে এসে ভরিয়ে তুলতে লাগলো।

চলছে ১৯৬০ সাল।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মানুষ ধৈর্যের শেষ পরীক্ষা দিল। শান্তিব পথ খুঁজল। কিন্তু পেলনা। বুঝতে পারল ভিক্ষে কবলে কিছু পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়না স্বাধীনতা। আদায় করে নিতে হয়। বুকেব বক্তঝবা পথে যে স্বাধীনতা আসে সে স্বাধীনতার স্মৃতি চিরকাল অক্ষয় অম্লান হয়ে থাকে জাতিব জীবনে। না হলে কদিন পবেই মুছে যায় তাব স্মৃতি, শুধুমাত্র সবকাবী স্বার্থপবেব মহলেই উদ্‌যাপিত হয় স্বাধীনতাব উৎসব লগ্নটুকু।

আমবা মুক্তি চাই। অন্যায়েব পাষাণ ভাব আমবা সহ্য কববো না। স্বেচ্ছাচাবী শয়তানদেব কবল-মুক্ত কবতে হবে আমাদেব পিতৃভূমি। আমবা প্রাণ দেব তবু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না।

সবাই চাইল উত্তবে। বলল, আমাদেব অনুমতি দাও তুমি।

আপনাব বিনা অনুমতিতে আমাদেব কিছু করার সাধ্য নেই।

তুমি আমাদেব পথ বলে দাও। এখন বল, আমবা কী করবো। শয়তানদের হাতে মাব খাব, শেষ হয়ে যাব?

শেষ? কে শেষ করবে তোমাদের? তোমাদের শেষ করার মত এত শক্তি কার আছে?

নেই-নেই। কোন শক্তি নেই তোমাদের শেষ কবে। এমন

কোন অস্ত্র নেই যা তোমাদের চলার পথকে রুদ্ধ করে। জানি, আমি সব জানি। সব জেনেই আমি ধৈর্য্য ধরে ছিলাম, অপেক্ষা করেছিলাম, শান্তির স্বপ্ন দেখেছিলাম। হিংসা নয়, শান্তিই যে মানুষের জীবন মন্ত্র।

কিন্তু পশুশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে আমি মনুষ্যত্বের অন্তরায় ভাবি না। পশুশক্তির কাছে যে শান্তি-বাণী উচ্চারণ করে, আমি তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে মনে করি। পশুর শাস্তি আঘাতে। আঘাত হেনেই তার পশুত্বের বিনাশ ঘটাতে হয়। পশুকে তার হিংস্রতার মাঝে ক্ষমা করা অপরাধ।

তোমরা আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছো। আমার শান্তির পথে বিশ্বাসী থেকে তোমরা চরম লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার সহ্য করেছো। এখন আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা জেগে ওঠো। আঘাত হানো। তোমাদের আঘাত যেন ওদের সমস্ত দম্ভ অহঙ্কার চূর্ণ করতে পারে।

আমি আছি। আমি রইলাম। আমি থাকবো।

শান্তির পথে ওরা পশুত্বের প্রকাশ ঘটালো বার বার। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা থেকে বিরত হল না। তখনই তিনি, ১৯৬০ সালে অনুমতি দিলেন সংগ্রামের। ভিয়েৎনামের অপূর্ণ স্বাধীনতার লড়াইকে শেষ করতে বললেন। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে বললেন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দম্ভকে।

তাঁর সে ডাকে জেগে উঠল মানুষ। ভিয়েৎনামের মানুষ। দক্ষিণের প্রতিটি মানুষ, শিশু, নারী এবার আর কেউ পিছিয়ে পড়ে রইলো না। তারা স্বাধীনতা চায়। চায় অখণ্ডতা। বিভক্ত ভিয়েৎনামকে তারা একসূত্রে গাঁথবেই।

এগিয়ে চলল তারা দুর্বার গতিতে। সে গতিকে রুদ্ধ করার সাধ্য আমেরিকার নেই। মার খাচ্ছে সে। তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে।

ভেঙ্গে গেছে তার তীক্ষ্ণ বিষাক্ত দাঁত, যে দাঁত নিয়ে সে বন্ধুর ছদ্মবেশে এসে দক্ষিণের বুকে কামড় বসিয়েছিল। আজ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পালিয়ে যেতে চায়, বাঁচতে চায়—ক্ষমতার দম্ভ তার শেষ হয়ে গেছে, তবু সে যেতে পারছে না। কারণ সে যদি আজ চলে যায়, তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। ছুনিয়াতে মুখ দেখাতে পাববে না।

সেই জন্যে ট্রুম্যান যে পথে শুরু করেছিল সে পথ থেকে নিক্সনেব সরে আসার সাধ্য নেই। ভিয়েৎনামের মাটিতে আমেবিকাব কবর যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততোক্ষণ সে সরে আসতে পাববে না। কাবণ সে শান্তি চায় না। ছুনিয়াব ঘবে ঘবে দেশে দেশে অশান্তির আগুন জ্বলুক এই তার কাম্য। সে মুখে শান্তিব বুলি বলে, মনে সানায় বিষের ছুরি। এই তার চরিত্র।

সে জানে জিৎতে সে পাববে না। জানে অধর্মের জয় কখনো হয় না। তবু সে এগিয়ে যায়। কারণ শয়তানী তার রক্তে মজ্জায়, মনুষ্যত্ব সে হারিয়ে ফেলেছে। সে দেউলে হয়ে গেছে। তবু সে তাব স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারছে না। সে বলতে পাবছে না আমি দোষী, অপরাধী, আমি মানুষ হতে চাই। ছুনিয়ার মানুষ আমাকে তোমবা ক্ষমা করো। আমাকে মানবধর্ম পালনের সুযোগ দাও। আমাকে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

বলতে পাবছে না ওবা। বলা সম্ভব নয ওদের পক্ষে। কাবণ পৃথিবীর মানবতাকে যে ওবা গলা টিপে হত্যা করতে চায়। পদদলিত করতে চায় ন্যায় নীতি।

পারছে না। পাববে না তবু চেষ্টা করছে। ওদেব চেষ্টাব শেষ নেই। ধ্বংশের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা থামবে না। আর যেদিন থামতে চাইবে, এড়াতে চাইবে মৃত্যু—ব্যর্থ হবে।

ওরা মরবেই।

মৃত্যু ওদের ভিয়েৎনামের মাটিতেই। কারণ...

এক রজনীতেই আমবা এগিয়ে গেলাম
কোয়াঙ নাম, থু খিয়েন, কোয়াঙ ত্রি,
সায়গন, বিয়েন হোয়া, দানাঙ, চুলাই,
ত্রানক রাকলিউ কোথায় নয় ?
গর্জে উঠল কামান আব
আমাদেব হাতেব বাইফেল
পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী
দাঁড়ালেন শক্রব বিরুদ্ধে।
এতো যুদ্ধ নয়, এ যেন এক
উৎসব বজনী,
আমাদেব আঘাতে আঘাতে কেপে উঠল
পেন্টাগন,
চিৎকাব কবে উঠল আতঙ্কে
দস্যুব দল

দস্যুব দল আজ বাব বাব আতঙ্কে চিৎকাব কবে উঠছে। তবু যেতে পাবছে না। যেতে পাববেও না ও। ভিয়েৎনামেব মাটিতে যে ওদেব শেষ শয্যা বচিত হয়ে আছে।

সে শয্যাব আকর্ষণ ত্যাগ কবে ওদেব পক্ষে যাওয়া যে সম্ভব নয়।

শয়তানের একমাত্র কাজ ধ্বংস করা। ধ্বংসেই তার আনন্দ। ধ্বংস করতেই সে শুধু শিখেছে। সৃষ্টি করতে সে জানে না। সৃষ্টির মাঝে যে কী আনন্দ লুকিয়ে আছে তার খোঁজ সে রাখে না।

ভিয়েৎনাম!

বিভক্ত ভিয়েৎনাম।

যে ভিয়েৎনামকে আমেরিকা এক হতে দেয়নি, একজাতি একপ্রাণ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে দেয়নি, সেই উত্তর ভিয়েৎনামেও ওবা ওদের রক্তাক্ত থাবা বসালো। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে যুদ্ধবাজের দল তাদেব যুদ্ধের ক্ষুধাকে প্রসারিত করলো দক্ষিণ থেকে উত্তরে। শ্মশান করতে চাইলো উত্তর ভিয়েৎনামকে।

উত্তরের মানুষ এই নির্লজ্জ আক্রমণ মেনে নিলনা। গর্জে উঠল একটি কণ্ঠ, মারো। ওদের মেরে শেষ কবে দাও। ওরা এলে ওদেব ফিরে যেতে দিও না।

সেই সঙ্গে মানুষকে বললেন, শুধু যুদ্ধ নয়। ওদের আক্রমণের জবাব দাও কিন্তু বন্ধ কোর না সৃষ্টি। কারণ আমবা শয়তান নই, মানুষ। শয়তানের ধর্ম ধ্বংস। মানুষেব কর্তব্য পালন করো তোমরা।

তাই ধ্বংসের মাঝেও সৃষ্টির কাজ চলেছে। তার গতি অব্যাহত। ওদের আক্রমণে সে ভয় পায়নি। থামায়নি তার কাজ। সে এগিয়ে চলেছে। উত্তর ভিয়েৎনাম ধ্বংসের মাঝেও পালন করে চলেছে মানুষের কর্তব্য।

১৯৬০ সালে ভিয়েৎনামের ওয়ার্কাস্ পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচী গ্রহণ করা হল।

১। সমাজতন্ত্রের আর্থিক ও কারিগরী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। মূল শিল্পের ওপর জোর দিয়ে দেশের শিল্পোন্নয়ন।

২। কৃষি, কুটির-শিল্প ও ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করা। কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান।

৩। জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন।

৪। দেশের জাতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীকে শক্তিশালী করা।

পবিকল্পনার কথাগুলি শুধুমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ রইলো না। নানান অসুবিধাকে দূরে ঠেলে মানুষ এগিয়ে চলল তার লক্ষ্যের দিকে। গড়ে উঠল বিরাট-বিরাট কলকারখানা :

শুধু শিল্প নয় কৃষিতেও পবিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল। ১৯৫৪ সালেব শেষে শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষিক্ষেত সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

শিল্পে অনগ্রসর উত্তব ভিয়েৎনাম মাত্র পাঁচটি বছরে প্রমাণ করলো কর্ম মানুষেব প্রধান ধর্ম। সদিচ্ছা যদি থাকে উন্নতির পথ রুদ্ধ কখনোই হয়না। যেখানে ১৯৫৫ তে উত্তর ভিয়েৎনামে শ্রমিক সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭,৪০০ সেখানে ১৯৫৯এ—৭৩,৪০০, ১৯৫১ তে—১০০,০০০, ১৯৫২ তে —৪৯,৬০০০, ১৯৫৫ তে —৫৭৮,০০০। উত্তর ভিয়েৎনামের সার্থক সমাজতন্ত্রের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ১৯৫৪ সালে হঠাৎ বাধা পেল। মার্কিন হানাদারদের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো অতর্কিতে। আন্তর্জাতিক রীতি, নীতি, আইনকে কলা দেখিয়ে শিল্পকেন্দ্র, রেলপথ, স্কুল, গির্জা, হাসপাতাল, মন্দির ধ্বংস করলো। আজও সে ধ্বংস করে চলেছে সমানে। নাপামের বিষাক্ত আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে গ্রামে, পথে ঘাটে, ক্ষেতে খামাবে। সে চায় ধ্বংস, চায় ভিয়েৎনামের শেষ।

কিন্তু শেষ হয়নি ভিয়েৎনাম। সরে আসেনি অর্থনৈতিক

অগ্রগতির পথ থেকে। মন হয়েছে ইস্পাত-কঠিন, মনোবল বেড়ে গেছে শতগুণ।

তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ আবার শোনা গেল। জাতির উদ্দেশে তিনি বললেন, আমাদের থামলে চলবে না। থামার কথা ভুলে যেতে হবে। আমরা এগিয়ে যাবাব প্রতীজ্ঞা নিয়েছি। আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। দূর করতে হবে সব বাধা।

বললেন, দিনে ওরা আসে, আমরা কাজ কববো বাতে। রাতকে দিন কবে আমবা এগিয়ে যাব আমাদেব নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আমরা থামবো না। থামলে আমাদের চলবে না।

বাতে চলছে কারখানা। মানুষ তাঁর কথা মেনে নিয়েছে। রাতকে দিন করেছে তাবা।

কিন্তু কৃষি কাজ? কৃষি কী থেমে আছে?

না কিছুই থেমে নেই। ভিয়েৎনাম যে থামবে না বলে প্রতীজ্ঞা করেছে। থামলে যে তাব চলবে না।

তাই কৃষকের দল কাঁধে বাইফেল নিয়ে দিনেব আলোয় সমানে করে চলেছে তাদেব কাজ। দস্যুব বিমান দেখলে ক্ষণিকেব মধ্যে লাঙল ছেড়ে হাতে তুলে নিচ্ছে বাইফেল। লক্ষ্য কবছে স্থিব। ওবা চলে যাবার পব কাঁধের রাইফেল আবার কাঁধে ফেলে হাতে তুলে নিয়েছে লাঙল।

উত্তর ভিয়েৎনামে যখন সমানে চলেছে বাঁচাব লড়াই, তখন দক্ষিণের ঘবে ঘবে খাদ্যের হাহাকাব। অথচ দক্ষিণই একদিন খাদ্যে ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। বিদেশে করতো চাল বপ্তানি।

দক্ষিণে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে দিন দিন। অথচ একদিন বেকাব সমস্যার কোন প্রশ্নই ছিল না সেখানে। আজ জোর করে তাদের সৈন্য দলে নাম লেখান হচ্ছে। বিশ্বপ্রেমেব মহান আদর্শেব ব্রতধারী আমেরিকা তার মানবতার আদর্শের সুষ্ঠু রূপায়নে মনোযোগী

হয়েছে সেখানে। সায়গনে আজ দেহ ব্যবসায়িনীদের ভিড়ে পথ চলা দায়। এ দানও আমেরিকার।

কিন্তু চুপ করে নেই মুক্তি সেনার দল। দক্ষিণের তিন চতুর্থাংশের বেশি আজ অস্থায়ী বিপ্লবী সরকাবের কর্তৃত্বে। মুক্ত অঞ্চলে ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট ও বিপ্লবী সবকার নতুন জীবনের স্পন্দন এনে দিয়েছে।

আমেরিকার সাধ্য কী ওদের জীবনকে স্তব্ধ করে দেয়! জাগ্রত ভিয়েৎনামের বাঁচার লড়াইকে বিপথে চালিত করে।

ভিয়েৎনাম ওদেব মুখোশ খুলে দিয়েছে। সাবধান করে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষকে।

তিনি বলেছেন, বাঁচতে যদি হয় নিজের চেষ্টায় বাঁচতে হবে। ক্ষুধার অন্ন পরিশ্রমের ফসলে মেটাতে হবে। ওদের সাহায্যের হাত শয়তানেব মৃত্যু ক্ষুধা নিয়ে এগিয়ে আসে।

ওরা সাম্রাজ্যবাদী। ওরা শয়তান। পৃথিবীর মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী কবে দলিত পিষ্ট করতে চায়। ওদের ডলারের মোহে অন্ধ হলে সাধ্য হবেনা মৃত্যুকে রোধ করা।

মনুষ্যত্বহীন সমাজ সৃষ্টি করতে চায় ওরা পৃথিবীর দেশে দেশে, ঘরে ঘরে। ওবা বিশ্বাস হারিয়েছে জীবনের প্রতি। মন ওদের নিশ্চিহ্ন হয়েছে দেহ অভ্যন্তর থেকে। দেহ ওদের কাছে আজ একমাত্র সত্য।

ভিয়েৎনামের মানুষ। তোমরা ভুল কোবনা। তোমরা প্রতীক্ষা করো নতুন দিনের, জীবনের, স্বপ্নের।

জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!

ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের!

মৃত্যু, তবু দাসত্ব নয়।

সাম্রাজ্যবাদী শয়তানকে ক্ষমা আমরা করবো না। প্রয়োজন হলে লড়াই করবো আমরা হাজার বছর।

আমরা বাঁচতে চাই। আমরা বাঁচবোই।

ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ!

হো চি মিন জিন্দাবাদ!

হো চি মিন তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে।

শুধু ভিয়েৎনামের মানুষের বুকের গভীরে নয়, পৃথিবীর মানুষের বুকে তোমার স্থান। সর্বহারা মানুষের মাঝে তোমার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন—চিরকাল।

১৯১১ সালে যাত্রা শুরু। পৃথিবীর পথে পথে ক্লান্তিহীন পথ চলা। নদী মরুভূমি পাহাড় ডিঙিয়ে পৌঁছালেন আপন লক্ষ্যে। এবার বিশ্রাম। ১৯৫৯ এর সেপ্টেম্বরে গ্রহণ করলেন শয্যা। শেষ শয্যায় শায়িত হলেন তিনি।

না-না শেষ শয্যা নয়। এ তাঁর বিশ্রামের কাল।

তিনি তো ঘুমান নি, তিনি জেগে আছেন। জেগে আছেন স্বদেশের মানুষের বুকের গভীরে, প্রতিটি রক্ত কণিকায়। ঘুমিয়ে পড়লে যে তাঁর চলবে না। জেগে থাকতে তাঁকে হবেই। শয়তানের দল যে পৃথিবীর ঘরে ঘরে কত শত সাজানো সংসারে হানা দিতে চাইছে। সভ্য দুনিয়ার নির্লজ্জ হানাদারী বন্ধ করতে তাঁকে যে জেগে থাকতে হবেই।

ঘুমাবেন সেদিন। যেদিন, অন্যায় অসত্য দূর হবে। শেষ হবে নির্লজ্জ শয়তানের দল। মানুষ নির্ভয়ে এগিয়ে যাবে তার আপন কর্মপথে। সৃষ্টির আনন্দের হিল্লোল বইবে দিকে দিকে। মায়ের বুকে নির্ভয়ে খেলা করবে শিশুরা। বিশ্ব শিশুর দল।

সেই দিন। সেই দিনই তিনি বিশ্রাম পাবেন। তাঁর স্মৃতি হবে মানুষের জীবন মন্ত্র।

আজ নয়। সে দিন এখনো আসেনি।

সেদিন আসবে।

সে দিন আসবেই।

বা দিনেব কংগ্রেস ভবনে রক্ষিত ডঃ হো চি মিনের সুসজ্জিত মর-দেহটি একটি কাঁচের আধারে রক্ষিত দেখতে পেলাম। তাঁর পায়ের কাছে আর একটি আধারে রক্ষিত তাঁর পাদুকা দুটি।

কলম নয় দুটি পাদুকা। ধূসর হয়ে গেছে চামড়া, ক্ষয়ে গেছে গোড়ালি, ছিন্ন হয়েছে স্থানে স্থানে। তবু কত যত্নে রাখা হয়েছে সে দুটিকে। জীবনের চলার পথের অক্লান্ত সৈনিকের স্মৃতি চিহ্ন।

অথচ রাখা যেত তাঁর কলমটি। যে কলমে তিনি কতশত অগ্নি-ঝরা বাণী সৃষ্টি করেছেন। জীবনের চলার পথে সংগ্রামে শুধু অস্ত্র নয়, শিক্ষাকেও তিনি আরোহণ করেছিলেন নিজের চেষ্টায়, বিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তাঁর ছিলনা, তবু তিনি ফরাসী, ইংরাজী, মান্দারিণ, চীনা ভাষা, রুশ আর জারমান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এছাড়া ছিল তাঁর মাতৃভাষা আন্নাম।

তবু কলম নয়, পাদুকা দুটি যত্নে রাখা হয়েছিল।

শবাধার ঘিবে অতন্দ্র প্রহরীর মত বসেছিলেন, অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট তনডাক থং, দলের প্রথম সেক্রেটারী লে দুয়ান, প্রধানমন্ত্রী ম ভান ডং আর জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ত্রুয়ং চিন।

বিদেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে আসছিল মানুষ। ভিয়েৎনামের মানুষ। তাদের প্রাণের মানুষটিকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছিল।

তিনি বলেছিলেন, কেঁদনা তোমরা। ভিয়েৎনামের মানুষ, তোমরা তোমাদের মনকে ইস্পাতের মত কঠিন, বজ্রের মত মহাতেজী করে তোল। কাঁন্না তো ভীরু কাপুরুষ দুর্বলের জন্যে। তোমরা তো ভীরু কাপুরুষ

দুর্বল নও। তোমরা কাঁদবে কেন? এ দুঃখ তো দুঃখ নয়। আরো চরম দুঃখ কষ্ট সহ্যর জন্য গড়ে তোল মনকে।

তবু তাদের চোখে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত অশ্রুধারা নেমে আসে। ডুকরে কেঁদে ওঠে তারা। পরক্ষণে লজ্জা পায়। অপরাধী কণ্ঠে বলে, তুমি আমাদের ক্ষমা কর। হো চি মিন, এই একটি দিনের জন্য তুমি আমাদের ক্ষমা কর। আমরা কাঁদবো না। তোমার কথা আমরা ভুলবো না। আমরা থামবো না। আমরা এগিয়ে যাব। তোমার পথে, তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

১০ই মে ১৯৫৯।

উইল করলেন তিনি। তাঁর শেষ ইচ্ছা। তিনি বললেন

বিদায়ের পরম লগ্ন যখন আসবে, তখন হৃদয় আমার ভারাক্রান্ত হবে শুধু এই জন্যে যে আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে আমি আমার প্রিয় জনগণের সেবা করে যেতে পারলাম না। আমার মৃত্যুর পর বৃহৎ কোন শোকানুষ্ঠান করে জনগণের অর্থ আর সময়ের অপচয় করা যেন না হয়।

সর্বশেষে আমি রেখে গেলাম—পার্টি, সেনাবাহিনী ও প্রতিটি স্বদেশবাসীর জন্য আমার গভীর ভালবাসা।

শেষ!

না-না শেষ নয়, এই তো শুরু!

তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

হো চি মিন তুমি আছ। নিশ্চই তুমি থাকবে। তোমাকে হারিয়ে যেতে আমরা দেব না।

কিছুতেই না।